দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি যতই বিশ্লেষণ করি না কেন,
দেখি, সবার শেষে এক কবি বসে আছে।'
—সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

১৯৬৭ থেকে ১৯৯৭— বামপন্থী রাজনীতির এই ঐতিহাসিক সময়টা বেছে নিলেও (এবং তার ব্যবহার যথাসাধ্য তথ্যনিষ্ঠভাবে করা সত্ত্বেও)— এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। সামাজিক, আঞ্চলিক, ঐতিহাসিক বা মনস্তাত্ত্বিক এ-রকম কোনও কবিতা হয় না। উপন্যাসও হবার কথা নয়।

এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস লেখা হয় কেবলমাত্র একটি সমস্যার সমাধানের কথা ভেবে আর সেটা হল, একটা গদ্য-রচনা করা যায় কিনা যা হবে কবিতার মুখপাত্র। বিষয়ে এবং আঙ্গিকে— উভয়ত।

আমি ও বনবিহারী

(আকাদেমি পুরস্কার ২০০২)

উৎসর্গ
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
কবি, নাট্যকার, মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য/১

অংশ ১

আমি এবং বনবিহারী এক লোক না। কিন্তু, বনবিহারী একথা মানে না। শুধু মানে যে না, তা নয়। সে আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছে।

অবশ্য, তাকে দোষ দিই কী করে। আমি কে; বা, কী। কিছুই না। আমার তো একটা নামই দেয়নি কেউ। নিজের নাম আমি নিজেই রেখেছি।

তাই, এমনই তো হয় আর সেটাই হরবখত, যখন তার ও আমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখাটা আমি নিজেই খুঁজে পাই না।

সুধী পাঠক, আমাকে 'প্রাণ' বলে ডাকুন।

ফুলশয্যার রাত থেকেই যদি ধরি, যদিও সেদিন পিরিয়ডের মধ্যে, প্রতিভা ও বনবিহারীর যুগলবন্দী বছর-কুড়িতে পড়ল। সে-রাতে রাগ করে বলেছিল সে, 'ধ্যুৎ। কী যে করো।' 'রেজিস্ট্রির দিন তো তুমিই ঠিক করেছিলে!'

'ছিঃ।' চোখদুটো বড় বড় করে আর চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে প্রতিভা বলেছিল, 'তুমি না আমার কমরেড?'

'চলো, ছাদে গিয়ে বসি।' বলে ডান হাতে ধরে তাকে ছাদে নিয়ে যায় সে। হাতে ধরিয়ে দেয় প্লাস্টিকের তৈরি একটা নতুন নক্সাদার মাদুর। মেঝেয় পাতা গদির বিছানা থেকে বনবিহারী নিজেই তুলে নিয়েছিল ফ্রিল-দেওয়া ডি-সি-এমের নতুন কাভার পরানো যে মাথার বালিশদুটো, তারাও নতুন। না-না, এগুলো দানসামগ্রী জাতীয় নয় কিছু। বিয়ের আগে ঘুরে ঘুরে এ-সকল তারা নিজেরাই পছন্দ করেছে। শোবার খাট এখনও এসে পৌঁছতে বাকি। গদি এসে গেছে।

পার্টির কমরেড এবং আত্মীয়স্বজনের শেষ লোকটি চলে যাবার পর, এখন অনেক রাত। ছাদে উঠে বনবিহারী দেখে আকাশে আস্ত চাঁদ একখানা। আর-এ, সে তো এর খবরই রাখত না। কতদিন দেখেনি আকাশকে।

আলো এত বেশি যে আকাশে তারা নেই বললেই চলে। বড় বড় বিমের কাটাকুটি ছায়া পড়ে আছে ছাদময়। অদূরে মাল্টিস্টোরিড উঠছে।

কনভেন্ট রোডে ৫২ ফ্ল্যাটের সি-আই-টি কমপ্লেক্স।

পাঁচশ স্কোয়ার ফুটের চারতলা বস্তি। মাঝখানে চিলতে তেকোনা পার্ক। একটা স্লিপার।

এখানে দিনের বেলাতেও কেউ ছাদে ওঠে না। এত উঁচু বাড়িও কাছাকাছি নেই, এক সি-আই-টি রোডের ওপারে নয়া মসজিদ ছাড়া। চাঁদ উঠেছে ওদিকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু পার্কের দিকেই মাদুর পাতে প্রতিভা। বালিশ দুটো নিতে গিয়ে, ঈষৎ আকর্ষণ করে তাকে কাছে টেনে জানতে চাইল, 'কীঈ, দিনটা খারাপ বেছেছি?'

বনবিহারী দেখল, আকাশে না থাক, প্রতিভার চোখ দুটিতে তারা নিঃসন্দেহে ঝকঝক করছে। কানের ঝিকমিক ইয়ারিং দুটোর জন্যে নাকে-চশমা কেমন পরী-পরী লাগছে না? পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে, ব্যালেরিনা-ঢঙে লেংচে কেমন উঁচু হয়ে উঠে জানতে চাইছে দেখো! সেই সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠছে কাঁধের প্রান্তদুটিও, বুঝি ডানাই বেরুবে।

আর এ কি হাস্কি কণ্ঠস্বর। এই স্বরে তো কখনও কথা বলেনি, আগে। কে বলবে এই সেই মেয়ে গত পাঁচ বছর ধরে যে মিছিলে প্রথম চিৎকারকারী ('প্রতিভাকে একটু আস্তে স্লোগান দিতে বলো বনবিহারী— মাইক তো রয়েছে' — প্রাণ) — এল-সি মিটিঙে কেন্দ্র ও রাজ্য পার্টির অনেক অমোঘ সিদ্ধান্ত যার হাতে ধুনুরির তুলোর মতো বং-বং শব্দে ওড়ে (এবং সে তা নোট করাতে বাধ্য করে)— শো-উইন্ডোর সদ্য-বিস্মিত মেয়ে-ম্যানিকেনের মতো সেই মেয়েই এখন মর্মরের মতো স্বচ্ছ কত কৌতূহল ভরে, এখনও উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে! যে কীঈ, দিন কি সে খারাপ বেছেছিল?

এটা যে ফাগুন মাস, বনবিহারীর তাও জানা ছিল না।

যেমন ধরুন, এইখানটায়। বর্ধমান কৃষক সম্মেলন থেকে সেবার লোকাল ট্রেনে ফিরছি, কী মনে করে বনবিহারী ঝালমুড়িঅলা ছেলেটার কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা ভাই, পূর্ণিমা কবে?'

তখন বিকেলবেলা। ছেলেটি ভরাভর্তি শালিমার তেলের কৌটার মধ্যে শিশি থেকে তেল মারা শেষ করে, ঘটরঘটর শব্দ তুলে মুড়িমশলা নাড়িয়ে চলল। উত্তর নেই।

বনবিহারী, পুনরায়— 'পূর্ণিমা কবে জানো তুমি?'

'না'। মুড়ি-ঘাঁটা থামিয়ে হেঁড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় ছেলেটি বলল, 'আমি আকাশ দেখি না।' এত বলে সে বাইরে গয়ের ফেলে।

এখানে আমার মনে পড়ল সে-কথা। কিন্তু বনবিহারী? তার তো পড়ল না মনে। তার মন থেকে এ-সব মুছে গেছে।

এমনি কত শত ঘটনা যে তার মন থেকে লেপেপুঁছে গেছে তার ঠিক নেই। যা আমি জানি। কিন্তু বনবিহারী জানে না। আর জানে না।

অংশ ২

৭২-এর বরানগর-কাশীপুর। জ্যোতিবাবুর নির্বাচন করতে গিয়ে হঠাৎ, একদিন ভাষা-বদল, ওদের। প্রতিভা আর বনবিহারীর। আমি জানতাম, আমিই ওকে পাব। কমরেড প্রতিভা সেনকে। সব চেয়ে বড় কথা, পার্টি জানত।

আমার মামা কৃষক নেতা হরিপদ মাস্টার। ৫০ দশকে বাগনান কৃষক সম্মেলনে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে মারা যান। তখন মঞ্চের ওপর। স্বাধীনতার প্রথম পাতায় ছবি বেরিয়েছিল। আর সবাই দাঁড়িয়ে। শুয়ে শুধু একজন। গলা পর্যন্ত লাল পতাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে, ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনে শহিদ হন ১০০ জন। গুরুতর আহত ১০০০। যে শতাধিক নিখোঁজ হন, প্রতিভার পিসেমশাই সত্যসাধন মজুমদার তাঁদেরই একজন। তাঁকেও না-নথিভুক্ত একজন শহিদ বলেই ধরা হয়ে থাকে।

তা বলে, পার্টির কাজে ছাড়া— মিটিং-মিছিল বাদে— আমাদের কপোত-কপোতী যথা কোনও নির্জন ঘুলঘুলিতে কখনও দেখা গেছে, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। দুজনকে একসঙ্গে সিনেমা কি থিয়েটারে ঢুকতে বা রেস্তোরাঁয় ঢাকা কেবিনের পর্দা তুলে একজন-একজন করে বেরুতে (প্রথমে বেরোয় মুখে-মৌরি সপ্রতিভ মেয়েটি)— কেউ কখনও দেখেনি। তবে সবাই জানত। আর সবচেয়ে যে বেশি জানে, সেই পার্টি জানত। উৎপল দত্তর 'তীর' দেখতে গিয়েছিলাম দুজনে, সে আলাদা কথা।

তারপর... আমার খুব ভাল মনে আছে (না থাক বনবিহারীর)— দিনটা ছিল ১৬ মার্চ, ১৯৭০। বেলা ১২টা নাগাদ আমি শ্যামবাজার কফি হাউসে ঢুকে দেখি বনবিহারী বসে আছে। একটু পরেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পড়ে যাবে। রাতে জারি হবে রাষ্ট্রপতির শাসন। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। মিছিলে মিছিলে ভরে যাবে কলকাতা। তবে তখনও কেউ নিশ্চিত নয়। এমন তো কতই ওঠে দমকা বাতাস। সবই কি আর ডেকে আনে কালবৈশাখী?

আমি বনবিহারীর হাতে সন্তর্পণে একটি চিঠি গুঁজে দিই।

পার্টি লেটার? না, এস-ও-এস।

বনবিহারীর তখনও-প্রতিভাদিকে লেখা আমার চিঠি।

'এইমাত্র: এল নাইনে: ওকে: দেখলাম। দুই একটা: ট্যাক্সি ধর্। ওভারটেক কর। বাসে উঠে: এই চিঠিটা ওকে দিয়ে আ-য়।'

যদিও কফি হাউসে ঢুকছি শান্তভাবে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার আগে অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এসেছি এবং সেটা লুকাতে পারছি না। ওর খোলা হাতে একখানা দশ টাকার নোটের সঙ্গে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে ওর হাতের মুঠো আমি বন্ধ করে দিই।

প্রতিভাকে পেতে পেতে পালপাড়া। আরও দেরি হলে হু-হু এল-নাইন পৌঁছে যেত গন্তব্য রথতলায়। তারপর প্রতিভা চলে যেত রিকশয় চেপে ফিডার রোড। ১১৭ নং বস্তি। সে ঠিকানা বনো জানে না।

চিঠিটা একেবারে হাতে গুঁজে দেবার ভঙ্গি দেখে পার্টির চিঠি ভেবে প্রতিভাও ভ্যানিটিতে রাখতে যাচ্ছিল— তেমনই হাতে-গড়া খাম। চিঠিও ছোট্ট। কী মনে হল, হঠাৎ জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার!'

'প্রাণ দিল আপনাকে দিতে।'

'ও প্রাণ!' ব্যাগে না ঢুকিয়ে এক পলক দেখে, মনে হল সবটা না পড়েই চিঠিটা রাস্তায় ফেলে দিল প্রতিভা। বাসের জানালা দিয়ে। পরে জেনেছিল, সবটা পড়েই। চিঠিতে লেখা ছিল একটাই লাইন : Meet me for the last time.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানাঘুষোয় জানা ছিল। দলবিরোধী কাজের জন্য কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে। কিন্তু, এক্সপেলড্ হয়েছে প্রাণ, জানত না। সে বয়সে মাত্র দু-বছরের ছোট হলেও, পার্টিতে কমরেড প্রতিভা সেন তার থেকে অনেক এগিয়ে। পার্টির কাজকর্ম শুরু করে স্কুল জীবনেই। সে পার্টি মেম্বার। তার কাকা মনমোহন সেন। জেলা কমিটির সদস্য। হোলটাইমার। এখনও থাকেন কমিউনে। ক্লোজ সিমপ্যাথাইজার থেকে বনবিহারী সবে ইউনিট মিটিঙে ডাক পাচ্ছে। তার জানার কথাও না।

প্রাণ তবু বনবিহারীকে ছাড়েনি অনেকদিন। অবশ্য চিঠি ফেলে দেবার কথা সে মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। নানা ছুতোয় বনবিহারী তুলতও প্রাণের কথা। বলতে গেলে পার্টিতে সে আমার রিক্রুট।

এই পর্ব চলছে, এমন সময় এসে গেল ৭২-এর ভোট। কলকাতা জেলা কমিটি থেকে জ্যোতিবাবুর কেন্দ্রে বাছা বাছা ক্যাডার পাঠানো হয়েছিল। প্রতিভার বাড়ি বেলঘরিয়ায়, এলাকার বিশিষ্ট কমরেডের হাতে ছিল অনেক দায়িত্ব, তার মধ্যে গোটা তিনেক বুথের ভোটার। ঝাড়া পনের দিন ধরে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে গ্রুপ-মিটিং করেছে— তখনও দেওয়াল-লেখার দায় পেশাদার পেন্টারের হাতে চলে যায়নি— ৭২-এর নির্বাচনে পার্টি অফিসে বসে নিজের হাতে পোস্টার লিখেছে বনবিহারী।

যবনিকা উঠল নির্বাচনের দিন, সকালবেলা। দেখা গেল মঞ্চ প্রস্তুত, কিন্তু কুশীলবরা কেউ ঘর থেকে বেরুতে চাইছে না। জেলে-পাড়ার বস্তির লোক বেলা ১২টার সময় ভোট দিতে গিয়ে ফিরে এল। তাদের গোটা বস্তির ভোট হয়ে গেছে। দু-একটা বোমার শব্দ শোনা গেল। গুজব— লাশও নাকি পড়ছে। ৭১-এর অভিজ্ঞতা বরানগর-কাশীপুরকে ঘরের খিল তুলে দিতে বলল (বলাও হয়েছিল, 'বাড়িতে থাকুন, গান-বাজনা শুনুন'— ইত্যাদি)। এরপর ভোটাররা বাড়ি থেকে ভোট দিতে বেরুল যার নাম সেই ১৯৭৭-এ।

পার্টি থেকে নির্দেশ এল প্ররোচনায় পা না দিতে। বেশিরভাগ কমরেড তো তখনও ঘরছাড়া। সন্ধের পর পার্টি অফিসের ঝাঁপ পড়ে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সিঁথিতে বাসে তুলে দেবার জন্যে প্রতিভাদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই অবাক-করা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল তখনও-প্রতিভাদি, 'কমরেড, আপনি মাঝে-মাঝেই প্রাণের কথা তোলেন কেন? কেন তোলেন? উনি তো আর আমাদের পার্টিতে নেই। ওঁদের মতো রেনিগেডদের জন্যই আজ আমরা এ-ভাবে হেরে গেলাম— একটুও রেজিস্ট করতে পারলাম না।' ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে আসে তার, 'কতদিন ধরে তলে তলে এম-এল পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন, ১২ আগস্ট এখানে গণহত্যার রাতে ওঁর রোল কী ছিল জানেন আপনি? ওঁর অ্যান্টি-পার্টি অ্যাক্টিভিটিজ সমস্ত বেরিয়ে গেছে পার্টি-লেটারে, আপনি কি কিছুই জানেন না? উনি তো বিট্রে করেছেন আমাদের পার্টিকে।

'আপনি কেন বলেন ওঁর কথা', হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চোখ আড় করে তুলে, অপ্রত্যাশিত, যার-পর-নেই কল্পনারও অতীত, প্রতিভাদি হঠাৎ জানতে চাইল, 'আপনার কিছু বলার আছে কী। আমাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনবিহারী? তারও কিছু বলার থাকতে পারে নাকি? পার্টি-হায়ারার্কি-তে প্রতিভা সেন অনেক উঁচুতে, বয়সেও অন্তত দু-বছরের বড়। তার একটা দান থাকতে পারে নাকি? অথচ, তার স্তম্ভিত চাহনির সামনে বলতে বলতে ক্রোধে ফেটে-পড়া মুখটা কেমন নরম হয়ে এল, গলার স্বর হঠাৎ নেমে এল খাদে, যা ছোঁয়া পেল এক পরম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার। মাথাও যেন একটু নেমে এল বুকের দিকে।

বনবিহারীকে প্রস্তরীভূত করে রেখে যে-কোনও একটা বাসের দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিভা। একবারও পিছনে তাকাল না।

এই প্রথম আমি দেখলাম, তার চোখের মণি কত নরম। এমন পরিপূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে সে তো কখনও তাকায়নি। তার চোখে এ সজলতা আমি তো কখনও দেখিনি। দেখলাম, তার চোখের কোলে কালি। বেশ কয়েকটা আঁচড়। পার্টি করতে করতে বয়স কি তার তিরিশের ধারে-কাছে পৌঁছে গেল?

অংশ ৩

আমার সঙ্গে সে-রকম কোথাও না গেলেও বনবিহারীর সঙ্গে অতি গোপনে, একান্ত নির্জনে দেখা করতে শুরু করল প্রতিভা। চিৎপুর ব্রিজের ওপর বাসস্টপে অ্যাপো করে খালধার দিয়ে ওরা প্রায়ই হেঁটে যেতে লাগল গঙ্গার পাড় অবধি। সেখানে গায়ে গায়ে লাগানো নৌকো, কেউ খড়ের, কেউ টালির, কেউ ইটের। নোঙর করা, প্রথম তীর ঘেঁষা নৌকোটির সঙ্গে বাঁধা। নৌকোর পর নৌকো পেরিয়ে, গঙ্গার বেশ খানিকটা ভেতরে শেষ নৌকোটিতে গিয়ে ওরা বসত। যদিও তখনও ওদের বাক্যালাপের অনেকটা জুড়েই থাকত পার্টি আর পার্টি লাইনের কথা— তবু ওই পার্টি-ভাষাতেই মিলেমিশে চলে আসত বিশেষত, প্রতিভার সুখদুঃখের কথা। বাবা রিটায়ার করবেন। দু বোন পড়ছে। ভাই স্টেট ট্রান্সপোর্টে অ্যাপ্রেন্টিস। তবে ডানলপ ব্রিজের কাছেই একটি মেয়ে-স্কুলে প্রতিভার চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে— শিক্ষামন্ত্রী নিজের হাতে অ্যাপ্লিকেশন নিয়েছেন বলে এল-সি-এম ধূর্জটি সোম তাকে জানিয়েছেন। তার গোটা পরিবার এখন ওই চাকরির দিকে তাকিয়ে।

হেন সময় সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল একদিন। এমন ঝড় যে তাদের শেষ নৌকো দড়ি ছিঁড়ে গেল বেরিয়ে, মাঝগঙ্গার দিকে। মাঝিরা হইহই করে উঠল। আর প্রতিভা ভয়ে জড়িয়ে ধরল বনবিহারীকে। এখানে ডুবজল। আর সে সাঁতার জানে না। সে ধরেই নিয়েছিল বনবিহারী জানে।

ওরা বসত ছই-এর ভেতরে। ঝড় থামার আগে আলিঙ্গন ওরা ছাড়াতে পারেনি। দুলতে দুলতে দপ করে নিবে গেল ঝুলন্ত হ্যারিকেনও। এবার শুরু অবিশ্রাম না-ছোড় চুম্বনের।

দেখা গেল প্রতিভা তার আগ্রহ ক্রমেই আরও আরও বাধা না দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছে। দেখা গেল, প্রতিভার একটি নিতম্ব অন্যটির তুলনায় বেশি ঝুলে থাকে। তার ওপরের ঠোঁটের নিচের চামড়া বেশ পুরু এবং একটুও নমনীয়তা সেখানে নেই, সেখানেও বয়স দেখা গেল। এ-সব লক্ষ্য না করে আমি পারি না।

কিন্তু বনবিহারীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশ ৪

সুধী পাঠক, আপনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন, বনবিহারীর জায়গায় কোথা থেকে উড়ে এসে জনৈক আমি বেশ ক'বার জুড়ে বসেছে। না-না, ভুল হয়নি। অনিচ্ছাকৃতও নয় বা অসতর্কতা। আমি মাঝে-মাঝে এসে পড়েছে তার নিজের গরজেই।

আপাতদৃষ্টিতে আমি এবং বনবিহারী একই ব্যক্তি মনে হলেও, রচনার একেবারে প্রথমেই কি বলে নেওয়া হয়নি, বনবিহারী ও আমি এক লোক না? তা না হলে আর প্রাণ বনবিহারীর হাত দিয়ে প্রতিভাকে চিঠি পাঠাচ্ছে কী করে?

ঠিকই যে, আমি ও সে একই দিনে এবং অদ্বিতীয় মুহূর্তে এই গ্রহে এসে নামি এবং আমাদের মাতৃগর্ভও একই। আমাদের দু'জনেরই জন্ম মাতৃগর্ভের অন্ধকার অভ্যন্তরে একই পরম-পরমাণু বিস্ফোরণের ক্ষণে। বস্তুত, আমাদের পিতাও এক; কেবল পিতৃপরিচিতি আলাদা।

ও যাকে বাবা বলে জানে এবং জানত, মানত এবং মানে— বাগবাজারের বোসপাড়ার সেই ধরণীধর মিত্র— আমি জানি আর আমার মা জানতেন আর বনবিহারী জানে না যে, আমরা তাঁর সন্তান নই।

বিন্ধ্যাচলের পরমপূজ্য যোগীরাজ ভোলাবাবা আশ্রমের অবদান, পার্সেলযোগে প্রাপ্ত 'শিলাজতু' নামে রতিবর্ধকের কারণে (বিন্ধ্য পর্বতমালার অজানা অভ্যন্তরে অজ্ঞাত শিবলিঙ্গাকার প্রস্তরখণ্ড নিঃসৃত ঘাম যা মধুসহযোগে ক্রিয়ার অর্ধপ্রহর পূর্বে সেব্য) সহবাস-পটুতা অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও ধরণীধরের বীর্যে কোনও নারীর গর্ভেই ডিম্বাণু উপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ, এই প্রতিবন্ধের কথা তিনি জানতেন না। তিনি শুধু জানতেন তাঁর স্ত্রী শতরূপার গর্ভসঞ্চার হতে দেরি হচ্ছে গর্ভাধান সংক্রান্ত অক্ষমতার জন্যই এবং তাঁকে বাঁজা বলে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে দেখেই সম্ভবত আমাদের মাতা পুরাণকথিত নিয়োগপ্রথায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন ও দাম্পত্য বিশ্বস্ততার চৌকাঠ ডিঙিয়ে নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পরীক্ষার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাকি ছিল শুধু উপযুক্ত সময় ও নির্ভুল সুযোগের অপেক্ষা।

আমাদের ঠাকুমা হলেও হতে পারতেন যিনি, সেই প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয় কলেরায়, সুদূর হরিদ্বারে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে প্রৌঢ়া বালবিধবা গিয়েছিলেন পূর্ণকুম্ভে। তীর্থঙ্কররা তাকে যথারীতি ত্যাগ করে চলে যায়— এবং দাঁড়ায় মাংসখণ্ড মুখে ডেঁয়ো পিঁপড়ের চলাচল থেকে সন্দেহক্রমে দরজা ভেঙে বমি ও পায়খানার মধ্যে তাঁর পূতিগন্ধময় শব আবিষ্কৃত হয়।

খবর পেয়ে সন্তানহীনা স্ত্রীকে নিয়ে ধরণীধর যখন হরিদ্বার পৌঁছলেন, তখন গঙ্গাতীরে প্রসন্নময়ীর সৎকার হয়ে গেছে। মড়কের কারণে সেবার ভারত সেবাশ্রম একটি কলেরা শাখা খুলেছিল।

হরিদ্বার যাবার পথে বারাণসী থেকে দুন এক্সপ্রেসে তাঁদের কামরায় ওঠেন শ্রীমৎ বাগীশ্বরানন্দ। পিওর সিল্কের সাদা থানের মধ্যে সেই দীর্ঘকায় মধ্যবয়সী মাখন-মসৃণ সন্ন্যাসীকে, জানালা দিয়ে শতরূপা দেখলেন, 'মহারাজ কি জয় হো' ধ্বনি তুলে শিষ্য-শিষ্যারা তাঁকে প্রণাম করছে।

কামরায় উনি এসে দাঁড়ালেন কিনা ওঁদের খুপরির সামনে! এবং কুশাসন পেতে বসলেন কিনা ওঁদেরই সামনের একতলার বাঙ্কটিতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিতব্য চিনে নিতে শতরূপার এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। তখনও দীক্ষা নেননি, দেখেই ওঁর মনে হল, দীক্ষা যদি নিতে হয় তবে এঁর কাছেই নিতে হবে এবং এটাই তাঁর বিধিলিপি। বস্তুত, লাল বিদ্যাসাগরীর মধ্যে তাঁর তুষারধবল পায়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অপরিচিতা গৃহবধূ তাঁকে গলবস্ত্রে প্রণাম করেছিল।

অচিরেই সেবার জন্য চারটি সন্দেশ। মুখে দিয়েই চমকে উঠলেন বাগীশ্বরানন্দ, 'একি, এ তো গিরিশের!'

সত্যিই তাই। কী করে বুঝলেন তার উত্তর রহস্যাবৃত রাখলেও, বোঝা গেল (শতরূপা বুঝলেন) পূর্বাশ্রমের চর্চা উনি এখনও ছাড়েননি। বললেন, 'হরিদ্বারে যাচ্ছেন, মথুরাবালার মালাই সন্দেশ খেতে ভুলবেন না।'

কনখলে ওঁর আশ্রমের কার্ড দিয়ে, হরিদ্বারে নয়, ওঁর আশ্রমেই উঠতে বললেন।

'বড় শান্তির জায়গা, বুঝলে মা, এই কনখল। পাশ দিয়ে বহে গেছে নীল গঙ্গা। শুধু নদী নয়, চারিদিকেই নিস্তব্ধতা। যেন মুনি-ঋষিদের তপোবনের ছবি। ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করে গঙ্গাকে নিয়ে আসার সময় স্রোতোধারা থেকে দুই কণিকা জল এসে লাগল প্রস্তরীভূত রাক্ষস খল-এর গায়ে। হল তার শাপমুক্তি। কণা আর খল এই দুয়ে মিলে কনখল।' বলতে বলতে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন কিছু সময়।

তারপর কী না-ভেবে যে বললেন, 'আনন্দময়ীও ওখানেই আশ্রম করেছে।'

'বাবা আমি শাপগ্রস্তা।' হরিদ্বারে পৌঁছবার আগে শতরূপা ওঁকে ট্রেনেই বলেছিলেন, 'আমি সন্তানহীনা'।

কলকাতায় বাড়ি ছিল প্রসন্নময়ীর নামে। একমাত্র সন্তান ধরণীধরের শ্রাদ্ধকর্ম ছাড়াও হরিদ্বারের দিকে অমন আঁকুপাঁকু দৌড়বার আর একটি কারণ ছিল বিধবার ডেথ সার্টিফিকেট। কনখলে সাতদিন সার্টিফিকেট জোগাড় করতেই কেটে গেল। এমনকি দু'রাত্রি থেকে যেতে হল হরিদ্বারে।

কনখলে গুরুদেবের শয়নকক্ষের সঙ্গে লাগোয়া ঘরটি ওদের দেওয়া হয়েছিল যা শুধু বিশেষ অতিথিরাই পেয়ে থাকে। বস্তুত আগে এটি ছিল মহারাজের ধ্যানকক্ষ, তাই দুই কক্ষের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী দরজাও থেকে গেছে। যে দুই রাত্রি ধরণীধর হরিদ্বারে ছিল, প্রথম রাতে মাঝখানের দরজায় টোকা দিয়ে আসেন স্বয়ং প্রভু। দ্বিতীয় রাতে, খিল খুলে অভিসারে যান শতরূপা নিজে। যাবার কথা ছিল না। প্রভু ডাকেননি।

মোট তিনবারের ঠিক কোনটিতে গর্ভে এসেছিল বনবিহারী, গভীরভাবে পরে ভেবে দেখেছিলেন আমাদের গর্ভধারিণী। ওঁর ধারণা ছিল নিশ্চিত ওই প্রথম দু'বারের মধ্যে কোনও একবার।

প্রথম রাত্রির তুলনায়, দ্বিতীয় রাতটিই ছিল তাঁর বেশি পছন্দের। কেননা, প্রথম রাতে সতীত্ব হারানোর ভয়, ধরণীধরের কাছে কৌমার্যস্খলনের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও ব্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। স্বামী দ্বারা সদ্য বিবাহিতার কৌমার্য-হারানোর মধ্যে একটা বোঝা-নামানোর ব্যাপার থাকে— উৎসবের আমেজের মধ্যে দিয়ে সেই দস্যুতা বা লুটপাট তথা পরস্বাপহরণ হয় বলে, তা আটপৌরে থেকে বেনারসীতে প্রবেশের চেয়ে বেশি গুরুতর কিছু বলে মনে হয় না। শরীর আমারই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ তো আমি স্বেচ্ছায় উপহার দিচ্ছি। আমি একে যা দেব, অন্তত ততটা ফেরত পাব। এতদ্দ্বারা আমি পাব সন্তান-সন্ততিক্রমে একজীবন নিরাপত্তা— সামাজিক, পারিবারিক এবং এমনকি ব্যক্তিগত।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল তা নয়। সন্তানধারণ না করার স্বাধীনতা তাঁর শরীরের নেই— পরিবারের বংশধর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে তাঁর নারী-শরীর অতি পরাধীনভাবে দায়বদ্ধ, শতরূপা দেখলেন।

প্রভুর সঙ্গে প্রথম রাতে শতরূপা আরও দেখলেন ফুলশয্যার রাতে জেনেশুনে কৌমার্য হারাতে গিয়ে তিনি এতটা অপ্রস্তুত ছিলেন না। সন্ন্যাসীর কুশলী ঠোঁটের অগ্রভাগ যখন তার জিহ্বাগ্র নিয়ে খেলা শুরু করল— নিজের জিহ্বাকে তার জিভে তুলোর প্যাড ছাড়া কিছুই মনে হল না। সন্ন্যাসী বললেন তাকে, সে যেন তার শরীর কণামাত্র নিজের জন্য না রাখে— তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। জ্যা-মুক্ত স্বাধীন তীরই শুধু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। শতরূপা মাঝে মাঝে বিষম রেগেও যাচ্ছিলেন নিজের ওপর। ন্যাকা! কচি খুকি! কুমারী নাকি! গত সাত বছর ধরে বিবাহিত হতে হতে শেষ কবে যে কুমারী ছিলিস সে তো তোর মনেই নেই। তবে এমন ম্যাদা মেরে পড়ে আছিস কেন লো ঢঙি?

পরবর্তী সুযোগ এল তিনদিনের মাথায়। ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। কিন্তু বদ্রিনাথ যাবার বাসের টিকিট আগের দিনই বিক্রি হয়ে যায়, তাই হৃষীকেশ যেতে হচ্ছে ধরণীধরকে। মুনি-কি-রেতির বাস-স্ট্যান্ডে কোনও হোটেলে রাতে থেকে যেতে হবে। ভোর হবার আগে প্রথম বাসে জায়গা না পেলে দিনের-দিন গৌরীকুণ্ড পৌঁছানো যায় না।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাতের মাঝখানে তিনদিন অনেক ভেবে দেখলেন শতরূপা। না, এ কোনও প্রেমের ব্যাপার নয়, যা নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তিনি গোটা কুমারী জীবন ধরে বিভোর হয়ে ছিলেন। বালিকার মতো, কুমারীর মতো, অর্বাচীনতাকে প্রশ্রয় দেবার কোনও কারণ আর নেই। প্রেম নয়, প্রয়োজনই তাঁকে বিশ্বাসঘাতিনী হতে বাধ্য করেছে। প্রাগিতিহাসের সময় থেকে মানুষের ইতিহাসপ্রবেশের মাঝখানটা, যেমন কোথায় হারিয়ে গেছে— মেয়েদের সতীত্ব থেকে ব্যভিচারে যাবার মাঝখানের সময়টুকুও যেন সে-রকম। যে হারিয়ে যায়, এবং এক মুহূর্তে এই তিনদিনের চিন্তায় সব দ্বিধা একেবারে লেপে-মুছে গেল। প্রথম রাতে শরীর সাড়া দেয়নি বলে, শরীরকে তাঁর মনে হল শত্রু।

দ্বিতীয় দিন, রাতের শেষ প্রহরে তিনি নিজের হাতে নিঃশব্দে খিল খুলে প্রভুর শয়নকক্ষে গেলেন। আজ কোনও দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। আজ বিছানাটি অনেক বড় আর উষ্ণ আর নমনীয় লাগল। আজ সতীত্ব হারানোর সঙ্গে স্বেচ্ছায় কৌমার্য উপঢৌকনের খুব একটা তফাত আর রইল না। বাগীশ্বর ঝা (ওঁরা বিহারি ব্রাহ্মণ) যখন ওঁর যুক্তিতর্কাতীত অবোধ স্তনবৃন্তে ঠোঁট রাখলেন— মনে হল যেন প্রথম স্তন্য দান করছেন অবশ্যম্ভাবী আত্মজকে— বাগীশ্বর সেভাবেই ব্যবহার করছিলেন বৃন্তদুটিকে। দুধে ভরে গেল তাঁর প্রথমে মাথা, তারপর সর্বাঙ্গ, সবশেষে অপত্যপথ। গর্বে ফুলে উঠল তাঁর শরীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্ভধারণের উন্মাদনার সঙ্গে এই দেহদান ছিল এমন সর্বতোভাবে তৃপ্তিসুখের যে, জন্মের তিনদিন পরে বনবিহারীকে তিনি যখন প্রথম স্তন্যদান করেন, দু'জনের গায়েই তখন একটা সুতোও রাখেননি। শতরূপা, অতএব, গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারে দ্বিতীয় রাত্রিটির সম্ভাবনাকে সবদিক ভেবে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিলেন।

কেননা তৃতীয় ও শেষবারের যে মিলন তাকে পশ্চাচার বললে কম বলা হয় আর সেটা ঘটেছিল প্রখর দ্বিপ্রহরে, হৃষীকেশে বদ্রির বাস ধরতে যাবার সময় শতরূপা যখন তাঁকে শেষবার প্রণাম করতে যান, তখন। স্নানে যাবার আগে বাগীশ্বর তখন ইম্পোর্টেড ইতালীয় অলিভ তেল মেখে জানালার ধারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না বলে এক ঝটকায় তিনি ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজস্ব স্নানাগারে। বিস্তৃত বিবরণে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে পাথর বসাবার জন্যে বাথরুমে তখন সবে খোয়া তোলা হয়েছিল, তাই গোটা ব্যাপারটা সর্বথা সঙ্ঘটিত হতে হয়েছিল, অবস্থানগত দিক থেকে, সমারূঢ় থেকে এবং সেইসব আসনে যাদের কথা না মিলবে কামসূত্রে, যারা না আছে যোগায়।

আজানুলম্বিত লৌহভুজদ্বয় দ্বারা তুলে ও ধরে রেখে কখনও— যখন দু'পা দিয়ে যোগীরাজের কোমর বেষ্টন করে ঝুলে আছেন শতরূপা— যোগের ভাষায় একে পবনমুক্তাসন বললে বলা যেতে পারে (যদি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে দেখা যায়)— আবার লুপ্ত মাধ্যাকর্ষণাসন বললেও অত্যুক্তি হয় না, যদি নতুন নামে একান্তই ডাকতে হয়। কখনও তার দেওয়ালে-পিঠ দুটি পা ফাঁক হতে হতে নদীর এপার-ওপারে— অথচ আগাগোড়াই বলতে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে— গোটা ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হয়ে গেল কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। যেন শুরুর আগেই শেষ। যেন দাঁড়ানো ষাঁড় ও গাভী। যাতে টুঁ শব্দটি বাইরে না যায় সেজন্য একই সঙ্গে ট্যাপ ও ঝাঁঝরি খুলে দেওয়া হয়, যে-জন্যে ভিজে যাচ্ছিল, পিছলে যাচ্ছিল অলিভ-পিছল প্রতিটি ধরতাই— তাই আরও আকুলভাবে আঁকড়ে ধরছিলেন শতরূপা, অবশ্য ঝুলন্ত যে-কোনও মানুষই পড়ে না যেতে চাইবে আর সেটাও ঘটনা। অন্যদিকে শব্দ বলতে বিশেষ কী আর। এক শতরূপার মুখনির্গত অ-আ-ও-ঔ প্রভৃতি কয়েকটি আদি স্বরবর্ণ ছাড়া।

না-না-না। নোংরা বাথরুমের ভেতর সেদিন যা হয়েছিল যে-কোনও পশ্চাচারকেও তা করবে অধোবদন। না-না। ছিঃ। ঐ নোংরা বাথরুমের মধ্যে কখনওই না। একবার তো প্রথাবিরোধী কমোডাসনেও বসতে হয়েছিল।

সত্যি সিদ্ধপুরুষ। কলকাতার ঠিকানা নেননি। যখন ধরণীধর তা দিতে চায়। 'গঙ্গামাইয়া চাইলেই, তোমরা আবার আসবে।' বলেছিলেন, 'ঠিকানা আমি নিই না। ঠিকানা বড় পিছুটান।'

তখন সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি চলছে। উঁচু মৃগচর্মাসন থেকে বাগীশ্বর যখন বললেন, 'মা-মা! এঁরা হলেন সাক্ষাৎ পার্বতী। যতক্ষণ এইখানেতে এঁদের রুনুঝুনু'— বাম স্তনের নিপল-এর ওপর তর্জনী রেখে দেখিয়ে দিলেন কোনখানে, 'ততক্ষণই আমরা শিব।'

লালপেড়ে কড়িয়ালে ঢাকা শরীর উপুড় করে প্রভুর পায়ে তখন তাঁর সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছেন শতরূপা, কারণ তিনি ততক্ষণে টের পেয়েছেন, তিনি যে মা হতে পারেন তা প্রমাণিত হতে চলেছে। তখনই কী করে টের পেয়ে গেছেন, তা কে বলবে। গর্ভসঞ্চারের প্রথম লক্ষণগুলো দেখা দিতে তখনও দু-সপ্তাহ বাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কনখল কি কেদার-বদ্রির পথে কেউ মাছ-মাংস স্পর্শ করে না। নারীও একপ্রকার মাংস। ধরণীধর মাসাধিককাল নারীমাংসকেও তাই সেই কুখাদ্যের তালিকায় রেখেছিলেন। পিতৃত্ব-সংবাদের আকস্মিক উন্মাদনা সে-কথা মনে রাখতে দেয়নি।

তবে না। কিছুতেই না। বাথরুমে নয়। বিপ্লবী বাথরুমে জন্মগ্রহণ করে না।

বিপ্লবের প্রতিশব্দ একটাই। আগুন।

অংশ ৫

প্রতিভার কাছে খবর ছিল প্রথম থেকেই। যে, প্রাণ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পার্টি পরে খবর পায়।

১৯৬৯ সালের ১ মে। মনুমেন্টের নিচে এম-এল পার্টির প্রথম প্রকাশ্য জনসভা। পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন কানু সান্যাল।

'দেখি না, ক'জন আসে। কী বলে-টলে। তুমিও চলো না', প্রাণ বলেছিল, 'গেলে তো জাত যাবে না।'

বলল বটে ওভাবে, কিন্তু প্রতিভা তখনই জানে, এম-এল পার্টি সম্পর্কে সে আর ততটা নিঃস্পৃহ নেই। ১ মে প্রতিভা ময়দানের সভায় না গেলেও, দু'বছর আগে ১১ নভেম্বর 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম কমিটি'র ডাকে ওরা দুজনে ময়দানের জনসভায় গিয়েছিল। তখন ছিল নিছক কৌতূহল।

চারু মজুমদারকে সেই একবার দেখেছিল। আবেগকম্পিত থরো-থরো গলায় দু-একটা কথাই বলেছিলেন। অসুস্থ, রোগা, হেঁড়ো। কালো ফ্রেমের চশমার মধ্যে মস্ত চোখ। তখন নকশালবাড়িতে সাপের ফণা দুলছে।

আমি বেশি কথা বলতে পারব না। আমি জানি আপনারা আমাকে নকশালবাড়ির নেতা মনে করেন। আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চান নকশালবাড়ি সম্পর্কে। কিন্তু আমি নকশালবাড়ির নেতা নই। নকশালবাড়ির প্রকৃত নেতা কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল, কমরেড খোকন মজুমদার, কদম মল্লিক এবং আরও সব কৃষক নেতা। — এরকম বলেছিলেন।

'অর্থাৎ, কৃষকের ভেতর থেকে উঠে এসেছে কৃষক নেতারা— পার্টির ভেতর অভ্যন্তরীণ আদর্শগত লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে দ্যাখো আমাদের পার্টির কী বিশাল নবজন্ম হচ্ছে।' প্রাণ বুঝিয়েছিল।

এবং তখন তাই মনে হয়েছিল। পার্টির কৃষক আন্দোলনের এরাই অগ্রবর্তী অংশ। যারা জমির লড়াই-এ অংশ নেবে এবং নিজেদের অধিকার সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করবে। যা জমি-বাঁটোয়ারা বা নব ভূদান নয়। এ-সব কথা তখন বিশ্বাসযোগ্য মনে হত প্রতিভার। তখন ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অনেক ঘনিষ্ঠ। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনও ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭ ওরা দু'জনে মিনার্ভায় 'তীর' দেখতে গেছে।

হল থেকে বেরিয়েই তো প্রথম শুনল, উৎপল দত্ত পি ডি অ্যাক্টে বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রেডিওর সন্ধ্যার খবরে বলেছে। তখনও 'তীর' দেখার স্তম্ভিত আবেগ কাটেনি। দশজন নিরপরাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষক রমণীকে অতর্কিত হত্যার দৃশ্যে দুই কমরেড দুজনের হাত চেপে ধরেছিল অন্ধকারে। সারা প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে প্রতিভাও উঠেছিল আর্তনাদ করে। প্রাণ-দের তখনও পার্টির বেশি-বিপ্লবী অংশ ছাড়া আর কিছু মনে হত না। আর এই তো সময়। জ্যোতি বসু ডেপুটি চিফ মিনিস্টার। কিন্তু সে তো হিমশৈলের শুধু মাথাটা। পার্টির প্রকৃত শক্তি তো জনসমুদ্রের মধ্যে লুকনো। আঘাত করবে সেই প্রবল পরাক্রম।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে অনেকদিন ধরে— '৬৭ থেকে '৬৯— এই দু'বছর তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ হয়েছে পার্টির ভেতরে এবং বাইরে। পথে-ঘাটে।

বিভিন্ন ইস্যুতে তখন কত ঝগড়াই যে করেছে ওরা। বেশি সময় তো প্রতিভার বলার কিছু থাকত না। প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় শুরু হয়েছিল শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলন। জ্যোতিবাবু বললেন, ঘেরাও নয়, শ্রমিকের জন্য ধর্মঘটই একমাত্র রাস্তা। হাইকোর্ট বলল, ঘেরাও বেআইনি। নাও, হাতে রইল মাকু, এখন ভ্যাঁ কর তো বাপু। বাবুগণ আইনসঙ্গত আন্দোলন করে যাচ্ছেন তারপর থেকে। এই কি লেনিনের শিক্ষা! মাও-এর শিক্ষা। 'প্রত্যেক কম্যুনিস্টকে এই সত্য বুঝতে হবে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকেই বেরিয়ে আসে।' শুধু কি মাও-সে-তুঙ। লেনিনও কি হাজারবার মনে করিয়ে দেননি, মুক্তির সংগ্রামে পার্টিজান ওয়ারফেয়ারের ইনএভিটিবিলিটির কথা। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে। কত দেখতে চাও তুমি।

১৯৬৯-এ প্রাণ তখনও পার্টিতে। তবে ভাষা বদলে গেছে আমূল। ততদিনে।... ক'দিন ধরে দ্যাখো, কী পড়ছি কাগজে— দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে। রোজ কাগুজে যুদ্ধ করছেন জ্যোতি বসু আর অজয় মুখার্জি। কী জন্যে। না, সংবিধান রক্ষার জন্যে। পরম পবিত্র এই সংবিধান! দাস ক্যাপিটাল তো এটা পড়েই! যেন চু-কিতকিত খেলা। একটা খোলামকুচি বুড়ো আঙুলের টুসকিতে এ ওর কোর্টে নিয়ে গিয়ে, তুই সংবিধান ভেঙেছিস। ও ঠেলতে ঠেলতে এর কোর্টে নিয়ে আসে। আঙুল মটকে বলে, তুই! তুই!

সংশোধনবাদী শয়তান যতসব। মন্ত্রিত্ব নিয়ে একযোগে হুক্কা-হুয়া করে চলেছে। এই যুক্তফ্রন্ট হাতিয়ার?— কীসের গা? না, শ্রেণী সংগ্রামের। ওখানে নাম্বুদিরিপাদ বলছেন জাহাজে ঢুকে জাহাজ ফুটো করে দেব। এখানে অশোক মিত্রের নামে কাগজে বিশাল হেডিং— 'ধনীর ঘুম কেড়ে নেব।' এখন প্রমোদবাবু বলছেন, এই সংবিধানের সিঁড়ি বেয়েই আমরা দিল্লির মসনদে উঠব।

বা-বা। বাঃ! আমি জলে নামিব, সিনান করিব, চুল ভিজাব না! এরা সোবিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল। এরা অজয় মুখুজ্জের বিরুদ্ধে গদির লড়াইকে আর জোতদারের সঙ্গে কৃষকের জমির লড়াইকে এক করে দেখে।

প্রতিভা যে এইসব আবেগের জোয়ারে ভেসে যেত তা নয়। সে নিয়মিত দেশহিতৈষী পড়ে। 'উগ্র বামপন্থার কবলে পড়ে ওরা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ভুল মূল্যায়ন করছে এবং বিদ্যমান শ্রেণীসম্পর্কগুলোকে অস্বীকার করছে'— সে জানে। সে নিয়মিত পার্টি ক্লাসে যায়। যুব-ছাত্র মিছিলে ইউনিট থেকে লিখে-দেওয়া স্লোগান দেয়। লেনিনকথিত অতিবামপন্থা ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে সে পুরোপুরি অবহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু তখনও অনেকখানি সত্যও মনে হত প্রাণ-এর কথাগুলো। কারণ, তখনও ওদের পার্টিরই একটা অংশ মনে হত।

১ মে ১৯৬৯ থেকে ওদের তৈরি হল নতুন পার্টি। যদিও প্রাণ ও তার গ্রুপের পার্টি ছাড়তে সময় লেগেছিল মুসলিম ইনস্টিটিউটে জি বি মিটিং পর্যন্ত। এবং প্রতিভা তার সাক্ষী।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা হবার পর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে জি বি মিটিংই হল পার্টির শেষ সভা যাতে প্রাণ যোগ দেয়। জ্যোতিবাবু বরানগর কেন্দ্রে এবার সাড়ে ১৭ হাজার ভোটে জিতলেন কী করে। কোন বুথে কত ভোট পড়েছে— কেন ওই বাক্সে ৪টে ভোট কমল আর ওইটাতে ৫টা বাড়ল— প্রতিটি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যেন প্রতিটি ব্যালট তুলে দেখালেন লেনিনসম প্রমোদ দাশগুপ্ত— মিটিং শেষে যখন সবাই নেতার ভোট বিশ্লেষণের প্রতিভায় বিমুগ্ধ— প্রতিভা দেখল, মাথা দুই হাতের ওপর উপুড় করে রেখে প্রাণ উল্টোদিকের গাড়ি-বারান্দায় বসে। কখন যে বেরিয়ে এসেছে, সে দেখেনি।

তালতলায় একটা মিষ্টির দোকানের কেবিনে বসে প্রাণের সেই ফেটে-পড়া ভোলার নয়। বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার।

সে পার্টির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় সেই দিনই।

হাঃ, এরা করবে বিপ্লব— এই ভোটের কড়ি গোনা ক্ষমতার কাঙালের দল। এই জন্যে আমরা পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি আর ডাঙ্গেয়াইটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন পার্টি গড়েছিলাম! ডাঙ্গেপন্থীরা যে কৌশলে বিরুদ্ধমতের লোকদের নামধাম প্রকাশ করে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, এরাও তো তাই করছে। আজ নয়, সেই নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে এইসব করা হচ্ছে। এবারের দেশহিতৈষীর পুজো সংখ্যায় প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পার্টির মধ্যে একটি গ্রুপ নিজেদের নামকরণ করেছে 'বিপ্লবী পরিষদ' বলে। ঠিক আছে। কিন্তু এরপর বলা হল, এঁরা হলেন পরিমল দাশগুপ্ত, লতিফ, কানাই, সুভাষ বোস, আজিজুল ও শৈবাল মিত্র প্রমুখ। এভাবে বিপ্লবীদের চিনিয়ে দেওয়া কেন? একি ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘ দিয়ে মারানো নয়? একটা গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে কত গ্রুপ থাকে। কত দলিল রাখে তারা। পার্টি তৈরি হয় ওইসব দলিল গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে। পৃথ্বীরাজ, কৌটিল্য..... এমন কত নামেই তো দলিল হয়েছে। এদের কি এভাবে নাম প্রকাশিত হয়েছে? যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার দিন থেকে বিপ্লবের যে-কোনও উচ্চারণকে অতিবাম বলে গলা টিপে ধরা হয়েছে। পার্টির মধ্যে বিপ্লবী অংশই ভেতরে আর বাইরে আক্রমণের লক্ষ্য।

'তাই, আজ আর কোনও উপায় নেই। যে পথ দেখিয়েছে নকশালবাড়ি তা ছাড়া অন্য পথ নেই। বারবার..... মধ্যবর্তী নির্বাচনের কুজ্ঝটিকা তৈরি করে সংশোধনবাদী ছাড়া কার কী লাভ? বিপ্লব তাতে কতটুকু এগোবে? বাঁচার পথ একটাই— কৃষিবিপ্লব। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও। শ্রমিকরা চালিকাশক্তি, কিন্তু কৃষকরা প্রাণশক্তি। এই পথই লেনিনের পথ, স্তালিন, লিন পিয়াও আর মাও-এর পথ। সেই আগুন নকশালবাড়ি জ্বালিয়েছে।'

বলতে, বলতে হঠাৎ হাত দুটো টেনে নিয়েছিল সে প্রতিভার। সেই প্রথম। কিন্তু, তার মানে অন্য। প্রতিভাও আসুক সেই পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাদের এই চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'-এর মানেটা কী? নিরুত্তাপ স্পন্দনহীন সেই হাত নিজের হাত থেকে ছেড়ে দিল প্রাণ। প্রতিভাও চুপ করে ছিল খানিকক্ষণ। দুজনের কেউই কথা বলেনি।

'তোমরা কি ভারতবর্ষকে মাওভূমিতে পরিণত করতে চাও?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ' আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ার মতো জ্বলে উঠল প্রাণ, 'হো চি মিন-এর নামে একখানা রাস্তা বা লেনিনকে পার্কের কোনায় বসিয়ে দিয়ে বিপ্লব করলাম ভাবতে পারো তোমরা। কেউটে লেনিন আর কেউটে হো চি মিনকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ঢোঁড়া বানাতে পারো তোমরা। আর আমরা ভাবতে পারি গোটা ভারতের নাম বদল করে মাওভূমি রাখার। হ্যাঁ, আমাদের রণধ্বনি হল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। এটা বলতে পারি আমরা। 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র আমাদের মন্ত্র'— স্লোগান দিচ্ছ না কেন তোমরাও! তোমাদের লজ্জা করে না?'

বলতে বলতে পর্দা তুলে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো। এমন কি বিল দিয়ে যাবার কথাও মনে রইল না।

প্রতিভা পার্টির কাছে ব্যাপারটা লুকাল না। ইউনিটে অভিনন্দিত হল সে। 'কমরেড সেন নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে যেভাবে পার্টির স্বার্থে উৎসর্গ করলেন তার জবাব নেই।' তাকে আলাদাভাবে ডেকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন ইউনিট সেক্রেটারি প্রণবেন্দু ধর। প্রাণকে বহিষ্কারের প্রস্তাবে সে মত দেওয়ায় প্রস্তাবটি পাস হল সর্বসম্মতিক্রমে। ডি সি-তে গেল। এমনকি প্রাণকে পোস্টে পাঠানো চিঠিটাও সে কমরেড ধরকে দেখিয়ে নেয় যাতে ছিল: আজ আমাদের দুজনের পথ ভিন্ন। তুমি বিপ্লবের পথে চলেছ। আর আমি তোমার মতে নয়া সংশোধনবাদী। আমাদের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

নাম ও সম্বোধনবিহীন চিঠি। যে মুখ ঘুরিয়ে যা বলার বলছে। চোখে চোখ না রেখে।

দৃশ্য/২

এই চিঠি পাবার পর প্রতিভাকে শেষবার দেখা করার আবেদন বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে।

অংশ ১

সুধী পাঠক, অনেক, অনেকক্ষণ হল আপনি এই কাহিনীর সঙ্গে। অনেকদিন। অনেকগুলো বছর। ১৯৭৫-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদের রাত থেকে কল্‌খলে শতরূপার গর্ভসঞ্চার পর্যন্ত (তা সে ধ্যানকক্ষ অথবা টয়লেট যেখানেই হয়ে থাক)— দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে, সময়ের সঙ্গে, আপনি তথাকথিত পিছনে হেঁটেছেন। পিছনে হাঁটলেও আপনি এতক্ষণ হেঁটেছেন ঘড়িঘণ্টা বা দিনপঞ্জির পরম্পরা ধরেই। আসলে তো, আপনি জানেন, না-জীবন, না-সময় কেউ এভাবে হাঁটে না। তারা না-সামনে যায়, না-পিছনে। তারা হাঁটতে জানে কিনা সন্দেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ান্ডারল্যান্ডে পৌঁছে অ্যালিস দেখল, কুয়োর মধ্যে একটা খরগোশ ঘুরছে তো ঘুরছেই। 'তুমি ঘুরছ কেন ভাই, এমন বনবন করে, আর, এ-রকম মিছিমিছি?' অ্যালিস জানতে চাইলে খরগোশ তাকে বলেছিল, 'আমি জন্ম থেকেই এ-ভাবে ঘুরছি। আর... থামতে পারি না। আমি যেখানে আছি সেখানে থেমে থাকতে হলে আমাকে এভাবেই ঘুরে যেতে হবে।' সময় এ-রকম। বন-বন-বন করে স্রেফ নিজে টিকে থাকবে বলে ঘুরেই চলেছে— একে ছুঁয়ে আর তাকে ছুঁয়ে। গ্রীষ্ম থেকে শুরু ধরে নিলে তবেই তারপর বর্ষা— অন্যথায় তো বর্ষার অনেক পরেই আসে গ্রীষ্মকাল। আজ কী বার? না, সোমবার। আজ সোম ধরে নিলে তবেই গতকাল ছিল রবিবার এবং আগামী কাল থেকে মঙ্গল ইত্যাদি। এ-ভাবেই ছক— ঘড়ি ঘণ্টা ক্যালেন্ডারের। এ-ভাবে ৫২ সপ্তাহে বছর, যেমন ৫২ তাসে এক প্যাকেট।

কিন্তু সুধী পাঠক, ৫২ তাসে সাজানো এইভাবে কাহিনীর পরম্পরা, ক্যালেন্ডার মোতাবেক কখনও এগিয়ে অথবা পিছিয়ে— কাহিনীকার ভুলে যান— এ তাসের প্রাসাদ ভেঙে ফেলার জন্য— তাঁর পাঠকের একটি জোর ফুৎকারই যথেষ্ট। ট্র্যাকে চলবে দৌড়বীর। যেখানে প্রতিযোগিতা।ট্রফি সেখানে। এখানে সে-সব কোথা। যেখানে শুরু হয়েছিল, এ কাহিনীর শুরু তো সেখানে নয়, সেখানেই নয়। আর এ কোথাও না-কোথাও শেষই বা হতে যাবে কেন?

এবং, ট্র্যাক, ট্রফি, তাসঘর, ফুঁ-বাবা— এসব যদি না-ভাবি। কারণ, এগুলো তো সবই অলঙ্কারিতা দোষে দুষ্ট মেটাফর— মিথ্যে দিয়ে শুরু বলে সত্য বলে কিছুটা প্রতিভাত হয়েও এইসব রুমাল হ-য-ব-র-ল'র বেড়াল হয়ে যায়! কী অবলীলায় জিভ ভেংচে এবং চোখ মেরে সবজান্তা ফিকিরবাজের হাসির হেঁয়ালি হয়ে জেগে থাকে।

ঐতিহাসিকের তৈরি ইতিহাসের এইসব স্বকপোলকল্পিত অগ্র ও পশ্চাৎগতির মাঝখানে পড়ে থাকে স্কন্ধকাটা কণিষ্করা। না-না, আমি শুধু প্রস্তরমূর্তির কথা বলছি না, সে তো থাকেই। ইতিহাসের মধ্যে পড়ে থাকে এমনই মুণ্ডহীন প্রাক-ইতিহাসও— যাদের কোনও বিশেষ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যায় না। অগ্রগামী সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভেসে ওঠে পুঁজিবাদের বুদবুদ, বিপ্লব প্রসব করে প্রতিবিপ্লবের কাঠের পুতুল।

অতএব, সুধী পাঠক, পরম্পরাময় ও বর্ণনামূলক এই লবেজান কাহিনীর কথক তথা কাহিনীকারকে ছুটি দিয়ে, আসুন, অতঃপর একজন অর্বাচীন আলোকসম্পাতকারীকে নিযুক্ত করি। যবনিকা তুলে দিয়ে সে এখন মঞ্চের যত্রতত্র আলোকসম্পাত করুক। এবং দেখা যাক এবার আমরা কী দেখি।

অংশ ২

ওমা, একি, এ যে বাথরুম। ভাগ্যিস কেউ নেই। সিলিং পর্যন্ত ঢাকা অফ-হোয়াইট ঢোলপুরি মার্বেলে। মেঝেরগুলি দেড়-বাই-চার ফুট করে। স্নানের জায়গা আলাদা। গ্লাস-প্যানেলের পার্টিশন, প্লাস্টিকের পর্দা। যাতে বাথরুম সবসময় খটখটে থাকে। সাদা-ছিট, চিক্কণ কালো পাথরের মাঝখানে প্রকাণ্ড, গোলাকার বেসিন, ঠাণ্ডা-গরম ট্যাপের মাথায় লাল আর সাদা টিপ। বেতের ট্রে ভর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কসমেটিকস— অধিকাংশ বিদেশি-- শ্যাম্পু চাররকম। একটু আগেই ব্যবহৃত হয়েছে, তাই ফ্ল্যাশের তোড়ে হারপিক কেক থেকে বেরিয়ে নীল ফেনা এখনও গজগজ করছে প্যানে। বাথরুম এখনও স্টিমের ধোঁয়ায় ভর্তি। এখুনি কেউ স্নান করে গেছে।

এই নবনির্মিত বাথরুমটি সল্টলেকের বি-জে ব্লকে অবস্থিত। এখন বর্ষাকালে রাস্তার দু'ধার কাঠগোলাপে সাদা হয়ে আছে। ফ্ল্যাটটি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের উচ্চপদস্থ তাত্ত্বিক নেতা বনবিহারী সেনের।

দেওয়ালে হংকঙের কৃত্রিম চীনে ঘাস লাগানো একটি ডেট ক্যালেন্ডার। ঘাসের ডগায় জমা বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ছে 4 Jan., 1989-র ওপর। টপটপ করে। এখানে এখন কোনও মৃতদেহ পড়ে নেই।

দৃশ্য/৩

অংশ ১

'অ্যাই। তুমি তো একজন কমিউনিস্ট। নেতৃস্থানীয়।' বনবিহারীকে ঠেলা দিয়ে প্রতিভা জানতে চাইল, 'তোমাকে এক-এক সময় মানুষ মনে হয় না কেন?'

'কোন কোন সময়?'

'এই যেমন এখন।'

'মানুষ মনে হয় না।'

'একদম না।'

ঠিক এ-রকম সরাসরি না বললেও এমন অনুভব আগেও হয়েছে। যদিও অন্যভাবে এসেছে তা। অন্য ভাষায়। ভিন্ন ছবিতে। কখনও তাকে হেডলেস মনে হয়েছে। মুণ্ডহীন। বলেওছে।

এই প্রথম একেবারে মনুষ্যত্ব ধরে টানা। 'এই একটা সময় যখন মানুষ আর মানুষে থাকে না' চিত হয়ে শুয়ে গোড়ালির দিক থেকে জাঙ্গিয়া টানতে টানতে (বডিবেসিক্স ছাড়া পরে না) বনবিহারী বলল, 'দ্যাট ইজ হোয়াই; মাই কমরেড। এই যে, এতক্ষণ ধরে আমি যা করলাম। তুমি কি মনে কর এর দায়দায়িত্ব সবটাই ছিল আমার। সবটাই আমি? সামবডি এলস্ ওয়াজ অলসো টেকিং পার্ট অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল।' প্রতিভার ঘাড়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে সে আদর জানায়, 'আই হ্যাড বিন অ্যাক্টিং মিয়ারলি অ্যাজ হিজ এজেন্ট।'

'এজেন্ট কোলাবরেটর?'

'শর্ট অফ।'

'সে মানুষ কিনা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সামবডি এলস্, বললাম তো তোমাকে। সামথিং এলস্ও হতে পারে।'

অংশ ২

সুধী পাঠক, এখন আলোকবৃত্ত এসে পড়েছে সেই দম্পতির শয়নকক্ষে, ১৯৭৭-এর জুন বিপ্লবের দিন জনজোয়ারে ভাসতে ভাসতে একদিন যারা পৌঁছেছিল রাইটার্সের সামনে। মনে করেছিল বিপ্লব শেষ। রাইটার্সের সামনে যাদের মনে হয়েছিল, স্মলনি ইনস্টিটিউটের বারান্দায় বক্তৃতারত কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখছে। তখনও তারা ছিল অবিবাহিত।

এখন আলো এসে পড়েছে তাদেরই ১০ বছরের দাম্পত্যের ওপর। সুধী পাঠক, পূর্বেই আপনাকে সতর্ক করা হয়েছে, এই আলো যে কখন কোথায় পেখম তুলবে তা অননুমেয়। ঘটনাবলী এখন ঔপন্যাসিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

অংশ ৩

কিন্তু বাকিটুকু দেখার আগে সুধী পাঠক, এখানে কিছু পরিপ্রেক্ষিত না দেখে নিলেই নয়। ১৯৭৮-এই বনবিহারী জেলা কমিটিতে। এখন ৭৮-তে ওরা রয়েছে সি আই টি-র একটি ছটাকি ফ্ল্যাটে। তবে সল্টলেকে পূর্বোক্ত কাঠগোলাপ এভিনিউ-এর কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাটটি ১০০০ স্কোয়ার ফুটের— সেখানে ওরা ১০ বছর পরে উঠে যাবে। জমি পাইয়ে দেওয়ার কারণে সে ফ্ল্যাটটি পাবে অর্ধেক দামে। বাকি ৯টি ফ্ল্যাটে স্কোয়ার ফিট প্রতি ৫০ টাকা বেশি নিয়ে (কাগজে-কলমে সেও তাই দেবে) উদ্যোক্তা এই ব্যবস্থা করেছেন।

কনভেন্ট রোডের এই সি আই টি ফ্ল্যাটটি সংগ্রহ করেছিল প্রতিভা নিজেই। তখনও মন্ত্রীতে-ক্যাডারে কমরেড সম্বোধন চালু ছিল। তাই প্রতিভা বলেছিল, 'কমরেড, জানেন তো ও কিছুতেই অ্যাপ্লাই করবে না, আপনি আমাকে দিন। আমি সই করছি।'

বনবিহারীই প্রতিভাকে এ-ভাবে বলতে বলেছিল এবং সে তাই বলেছিল। এত আগ্রহ! ব্যাচেলর হলেও, মন্ত্রী ওদের সুইট হোমে আগ্রহী হয়ে পড়েন। আবাসন তাঁর দপ্তর না হওয়া সত্ত্বেও। ৭৮-এ বনবিহারী ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে। তখনও যেতে পারেনি। তখনও ছিল 'সাপ মরুক, কিন্তু লাঠি যেন না ভাঙে' নীতি। ৮০-তে সে ঢুকল রাইটার্সে, একেবারে মন্ত্রীর সি-এ হয়ে। তখন থেকে দেওয়া-নেওয়ার রাজনীতিতে সে জড়িয়ে পড়ল নিজেই।

এত দ্রুত যে, প্রতিভা কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না। সে ভেবেছিল রাজনীতির ব্যাপারে তাদের চিন্তা-ভাবনা যখন অভিন্ন, বিবাহিত জীবনেও তার ছায়া পড়বে। রাজনীতিতে অন্য পথে গেল বলেই তো প্রাণের চিঠি সে ওভাবে ফেলে দিয়েছিল বাসের জানালা দিয়ে। বনবিহারী সাক্ষী গোটা ব্যাপারটার।

সে ভেবেছিল, তাদের বিবাহিত জীবনের প্রেম তাদেরই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বরলিপি মেনে, একটা সুন্দর, ছন্দোময় সুর ধরে চলবে। কিন্তু বিয়ের পর খুব কম দিনের মধ্যেই সে বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারল এ সেই সম্পর্ক নয়, যার খুঁটিনাটি নিয়ে সে দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে চিন্তাভাবনা করে এসেছে। বস্তুত, এ একেবারে অন্য জিনিস, আর এ জিনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বেঁধে ফেলল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। না-শরীর, না-মন— কিছুই তার এ-জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সারাদিন যেমন-তেমন, কিন্তু বিশেষত রাতের বিছানায় তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজের জন্য (সেই ব্লাউজ খোলা থেকে) সে দিনে দিনে বেশি বেশি লজ্জিত হয়ে পড়তে লাগল। অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বনলতা এসে গেল পেটে।

বনি তখন সবে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে ঢুকেছে। প্রতিভা মাসে একবার অন্তত যায় ওর কাছে। ক্লাস ফোরে পড়ছে যখন, শান্তিনিকেতনের ট্যুরিস্ট লজে একদিন, আয়নার সামনে সায়া নামিয়ে নিজের কুঁচকে মিইয়ে যাওয়া খাঁড়ি ও উপখাঁড়িবহুল পেট সহসা-দেখে সে কেমন অধীর হয়ে পড়েছিল! সে তাড়াতাড়ি তার মুখটুকু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে যায়। দেখেছিল বুক খুলেও। কোথাও কোনও সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি। মাত্র দশ বছর যেতে না যেতেই সমস্ত প্রতিরোধ কী করে আর কখন এ-ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল?

অংশ ৪

বনবিহারী যে এমনি একটা উত্তর দেবে প্রতিভা তা জানত।

'তুমি কী আশা করেছিলে?'

'আশা! লাঙল যার, জমি তার— জানো না তুমি?'

'এ-সময় কেউ জমির মালিক থাকে না', বনবিহারী বলে চলে, 'কম্যুনিজম নয়। বরং, ক্যাসিজমের খুব কাছাকাছি এ-সব। অকুপায়িং আদার্স টেরিটোরি বায় ফোর্স।

নিশ্চিত সুখ পায় বনবিহারী এইসব বলে। এ-ভাবে বলে। এইসব ভাষায়, শব্দে, আপাত-সিনিসিজমে আছে, তার মতে, এক ধরনের নাগরিক আধুনিকতা আছে আর যে অর্থনীতি, যে রাজনীতি আধুনিক নয় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমস্ত ধোঁকার টাটি ভেঙে দিয়ে দ্যাখো আধুনিক চীন কোথায়। আর অর্বাচীন রাশিয়ার এ কী পরিণতি! কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস! সি-আই-এস জার্সি পরে ইউরো সকারে খেলতে নামছে।

কথাগুলো শুরুতে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হত প্রতিভার।

সুধী পাঠক, ওই দেখুন, বনবিহারীর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে প্রতিভা।

'আমি তো সে-কথা বলিনি।' ওকে কাছে টেনে এনে প্রতিভা বলছে, 'মানুষ মনে হয় না কেন তোমাকে'?

অংশ ৫

তখন মানুষ মনে হয় না। রেড আর্মি যারা জার্মানিতে ঢুকেছিল, তারাও ছিল কমিউনিস্ট। কিন্তু সৈন্যদের নিজস্ব নিয়মেই তারা দখল নিয়েছিল জার্মানির। স্তালিন বলেছিলেন, হ্যাঁ, কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিক-ওদিক হয়েছে— আমি জানি। কিন্তু জার্মান সৈন্যরাও ওদের মা-বোনেদের রেপ করে গেছে। এখন জার্মানিতে যদি কিছু এদিক-সেদিক হয়ে থাকে, আমি ওদের দোষ দিতে পারি না।

এ-সব কথা তখন সুধী পাঠক, যখন সে বিছানায় এবং নগ্ন। এখন পাশাপাশি শুয়ে এবং গায়ে একটি র‍্যাপার টানা থাকলেও, একটু আগেও প্রাইভেসি বলতে তার কিছু ছিল না। এই নিদারুণ শীতেও সে লেপ ফেলে দিয়েছিল মাটিতে— যদিও সে দৃশ্য আমরা দেখিনি। কাজেই, তখনও, অন্তত তদবস্থায়, কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্যই মনে হত প্রতিভার। সে তো নিজেও তখন টের পেত না সাম্য ও স্বাধীনতাকামী তার শরীরোত্তর সমস্ত স্বপ্ন কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সীমান্ত পেরিয়ে একটা মুক্তিকামী দেশের দখল নিচ্ছে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল, কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধী দেশপ্রেমিকরা— সবচেয়ে যা হতাশার— তার শরীরও আক্রমণকারীর সঙ্গে নিয়েছে কোলাবরেটরের ভূমিকা।

'অ্যাই।' চোখ পাকিয়ে ধমক দেয় সে, 'চেকোস্লোভাকিয়ায় রেড আর্মি ঢুকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল?' বলতে বলতে কেন যে তার চোখে এসে গেল কোলাবরেটরের নির্লজ্জ কটাক্ষ, 'পারল? হোনেকার তো পালাল।'

এই সময় পাশের ঘরে ফোন। জাঙিয়া পরেই উঠে গেল বনবিহারী। ফোনটি ছিল মন্ত্রীর। তবে সে তা জানত না। তাহলে নিশ্চয়ই, অন্তত পাজামাটা গলিয়ে নিত।

'এ সবই পাসিং ফেজ। গরবাচভ সি-আই-এ'র এজেন্ট। তবে পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে', ফিরে এসে বনবিহারী জানায়। না, ইউরোপে মার্কসবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজেনি। এ-সব অপপ্রচার। মার্কসবাদ অমর— সে জানায়।

দৃশ্য/৪

অংশ ১

৭৯-র শেষের দিকে দমদম জেলের গেটের বাইরে বেরিয়ে আমি দেখলাম, পার্টির লোক বলতে শুধু একজন দাঁড়িয়ে আর সে হল অসীম সামন্ত। দিন সাতেক আগে ছেড়েছে যাদের, তাদের কেউ ওকে খবর দিয়েছে— আমাকেও যে-কোনও দিন বের করে দেবে। গত ৫ দিন ধরে ও রোজ এসেছে। খোঁজখবর নিয়ে গেছে। পুলিস বোরখা পরিয়ে ওর খুড়তুতো ভাই খোকনকে এনেছিল। নিঃশব্দ তর্জনী তুলে খোকন দেখিয়ে দিয়েছিল। তখন বিকেলবেলা। নারানপুর মিশন হসপিটালের নার্স কমরেড বাসন্তী সোরেনের বাড়ির উঠোনে বসে আমি তখন চা খাচ্ছি। ভুল করে কেন যে তর্জনীটাই তুলল খোকন। ওর ওই আঙুলটাই ভেঙে গিয়েছিল আর আজও সেটা বঁড়শির মতো বাঁকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ শুধু অসীম এসেছে। প্রায়শ্চিত্ত করতে?

হাজরা পর্যন্ত অসীমের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কাফে রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম, হাজরা মোড় থেকে দু'জনে দু'দিকের বাস ধরব এবং একটু পরেই ছুটন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে নিশ্চিন্ত হব যে কোনও খোচড় ফলো করেনি— তারপর মিনিট পনেরর মধ্যে আমরা হাজরা মোড়ে কাফে রেস্তোরাঁতেই ফিরে আসব।

কাফে-তে বসে পার্টির খবর দিতে লাগল অসীম। কে কে এখনও জেলে। কারা কোথায় আর কী করছে। বিশেষ করে শুনলাম বরানগর গণহত্যার পরবর্তী অধ্যায়। কীভাবে মেরুদণ্ডের গাঁটগুলো একটা একটা করে খুলে গেল। কারা খুলে নিল। পার্টি বলতে, আর কিছুই থাকল না।

অংশ ২

'তুই প্রতিভার ফোন নম্বরটা জানিস'

'প্রতিভা সেন?'

'সেন? ও। আ-হ্যাঁ।'

'ওর স্কুলে ফোন থাকতে পারে।'

'স্কুল?'

সল্টলেকের বি-ডি গার্লসে চাকরি পেয়েছেন প্রতিভাদি। ফ্ল্যাটে ফোন আছে কিনা জানি না।'

'ফ্ল্যাট?'

'এখন তো সি আই টি ফ্ল্যাটে রয়েছে। কনভেন্ট রোডে। ফ্ল্যাটে ফোন আছে নিশ্চয়ই। ডি সি এমের বাড়িতে ফোন থাকবে না? তবে ওখানে বেশিদিন থাকবে না। সল্টলেকে জমি পেয়েছে। নিশ্চয়ই বাড়ি করে উঠে যাবে। তখন একটা গ্যারেজও থাকবে নিশ্চয়।'

'ফ্ল্যাটটার নম্বর জানিস?'

'নাঃ।'

'এই তো অনেক জানিস?' আমি হেসে বললাম, 'আর নম্বরটা—'

'এ-সব কানে আসে, তাই বললাম তোমায়। এঃ—' নাক-মুখ কুঁচকে অসীম কাটলেটের টুকরোটা ডিশে নামিয়ে রাখল, 'এটা খেতে না, এটা পড়া।

'তুই কী করছিস?'

'আমি? আমি নারানপুরে ফিরে গেছি। লোক ধরি, আর ইনসিওরেন্স করাই। ভাগ্যিস, বাপ ছিল জোতদার আর সে-বাবদে ছিল কিছু জমিজমা! নইলে না খেয়ে মরতে হত। সে যাক। এখন তুমি কী করবে বল। চল না, ক'দিন থেকে আসবে নারানপুরে।'

আমি চুপ করে আছি দেখে অসীম জানতে চাইল, 'আজ কোথায় উঠবে?'

'দেখি। উঠতে তো হবেই কোথাও।'

'হোটেলে তো উঠবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উঠতেও পারি। অ্যারেস্টের সময় পকেটে বেশ কিছু টাকা ছিল। ব্যাঙ্কে যা ছিল সব তলে নিয়েছিলাম তো তখন। রিলিজের সময় কড়াক্রান্তি ফেরত দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তোর কিছু লাগবে তো বল। পাঁচ-সাতশো দিতে পারি।'

'রাইটার্সে যাও না তুমি। চাকরিটা তো ফেরত পেতেও পার।' অসীম বলল, 'অনেকেই তো পাচ্ছে।'

যাবার সময় অসীম একটা ফোন নম্বর দিয়ে গেল। ও আরও দুদিন কলকাতায় আছে।

অংশ ৩

'শোনো, অনেকদিন পরে বিরক্ত করছি তোমাকে।'

'_____'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

(ভাল আছি কি নেই তোমাকে জানাতে চাই না। আমি খুব ভাল আছি অথবা নেই। কিন্তু কোনওটাই তোমাকে জানাতে চাই না।)

'শোনো, আমি পরশুদিন ছাড়া পেয়েছি। আজই রাতের বাসে নারানপুর যাচ্ছি। অসীমের বাড়ি। অসীম সামন্তকে মনে আছে কি তোমার? সেই যে, যার সঙ্গে গঙ্গা সাঁতরে পার হই? শিবমন্দিরের সর্বেশ্বর বলেনি তোমায়?

'_____'

'ঝাঁপ দিতে যাবার আগে দেখলাম, শুধু তোমার কথাই মনে পড়ছে। আসলে অনেককাল কাটিনি তো সাঁতার। নার্ভাস লাগছিল। তাই ওকে বলে গেসলাম। ওপার পর্যন্তই সাঁতরাতে হয়েছিল। অত রাতে, হাঃ হাঃ, নৌকো কোথায় বল? কী, কথা বলছ না যে?'

'_____'

'যাক শোনো, পুরনো চাকরিটা ফেরত চাই। মন্ত্রী ধরলে, অনেকেই নাকি রি-ইনস্টেটেড হচ্ছে। তুমি মন্ত্রী-টন্ত্রি কারুকে বলতে পারবে?'

'_____'

'নারানপুর যাবার আগে তোমাকে একবার দেখে য়েতে চাই।'

'_____'

'তোমার ফ্ল্যাটের নম্বরটা দেবে। কীভাবে যেতে হবে?'

'_____'

'তুমি কি একবার আসতে পারবে প্রতিভা? তাহলে আমি আর-একদিন থেকে যাব।'

'না'

'কুড ইউ মিট মি ফর দ্য ভেরি লাস্ট টাইম?'

'_____'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পারবে না?'

'না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। বিয়ে করে কী-রকম আছ?'

নিস্তব্ধতা।

'হ্যালো?'

'হ্যাঁ?'

'যা শুনলাম তাহলে সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

(চুপ, দু-চার মুহূর্ত)।

'আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।' (ওদিক থেকে)।

'ঠিক আছে।' তখুনি কাটল না। আরও কিছু শোনার আছে কিনা— অপেক্ষা করল। অন্তত দশ সেকেন্ড পরে— কট!

('কুড ইউ...ফর দা লাস্ট টাইম' মনে পড়ল এই নিয়ে দু'বার। বললাম চার্লি চ্যাপলিনের একটা মূক ও বধির ফিল্ম থেকে। স্কুলে পড়তে টকি শো হাউসের মর্নিং শো-তে দেখা। একটা আর্ট-ওয়ার্ক করা সুন্দর বর্ডারের মধ্যে অবিস্মরণীয় সংলাপটি সেই থেকে মনে আছে এবং আবার আমার মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল। ওই যে, চার্লি তার রগের ওপর রাখছে রিভলভারের নল, গুলির শব্দ। আমি আবার দেখতে পেলাম। ওই যে, আমার শরীর ঢলে পড়ছে।)

জেলে ডায়েরি লেখা শুরু করেছিল প্রাণ। সেদিন রাতে লিখল: End of an affair. Of 9 years standing. This is how the world ends. With a whimper, that is.

সুধী পাঠক, আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেখছেন তো, আমাদের অগোচরে এই কাহিনী আবার কেমন গলায় বকল্‌স-বাঁধা পুড্‌ল্‌-এর মতন টাট্টি করবে বলে ক্যালেন্ডারের মাটি শুঁকতে শুরু করেছে। আসুন, একে এবার সত্যি-সত্যি ছেড়ে দিই। দেখি এ কী করে। অ্যা না হিসি। কোথায় কোথায় যায়। নাকি, দৌড়েই পালাবে?

দৃশ্য/৫

অংশ ১

(তিয়ান-আন-মেন স্কোয়ারে ট্যাঙ্ক প্রবেশের দিন: ৪ জুন ১৯৮৯।)

'ওমা লোডশেডিং হয়ে গেল যে।'

ওরা তখন খেতে বসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লোডশেডিং মাসিমা? কই?'

'লোডশেডিং হয়নি? কী বলছিস তুই!'

তার মুখের ওপর দিয়ে বেঁচে থাকতে সেই ভয় খেলে গেল যার অন্য নাম মৃত্যু। মৃতের হাসি হেসে তবু সে বলল, 'যাঃ।'

দু'হাত বাড়িয়ে সে কী যেন, কাকে যেন, খুঁজল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল টেবিলের কোনা ধরে। সে শেষ যাকে দেখতে পেয়েছিল তার নাম ভয়। তারপর থেকে ভয় ছাড়া সে আর কাকেও, আর কিছু দেখতে পায়নি।

...না-না, ইন্ডিকেশান ছিল। ছিল বৈকি। নক না করে আসে না। বিদ্যুতের মতো ফ্ল্যাশ, ঝুল উড়ে যাচ্ছে, কালো স্পট উড়ছে, হঠাৎ ঝরঝর করে ঝরে পড়ল একরাশ স্পট, কি জোনাকি উড়ে গেল— এ-সব তো দেখতেন। ভিশন-এরিয়ার খানিকটা মাঝে মাঝে কালো হয়ে যেত না? বুঝতে পারেননি যে চোখে ওই-রকম একটা ডাল পেইন— এটা কত গুরুতর ব্যাপার। মানুষ মনে করে, চোখ? হ্যাঃ, ও তো বেগার দিতে এসেছে। ডাকলেই বলবে— হুঁজুর? হাত জোড় করে দাঁড়াবে। চোখ যে আছে, মনেই থাকে না মানুষের। নিজেকে মনে করে চলমান দূরবিন, দেখতে থাকবে, দেখতেই থাকবে। দাঁতের মতো ছোটলোক তো না, যে রাতের ঘুম ছুটিয়ে আসবে। কিন্তু এখন, এখন তো আর করার কিছু নেই ম্যাডাম। এটা এক ধরনের ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাকের মতো। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ব্রট বোথ অফ দেম ডেড।

'আপনার চোখদুটো আলতার মতো লাল হয়ে গেছে মাসিমা। আর তারা দুটো নড়ছে না।'

অংশ ২

প্রতিভা কী কী দেখতে পাবে না। তারই অপছন্দ বলে বিবর্ণ বিস্কিট কালারের বদলে উজ্জ্বল বোগেনভিলিয়া রঙের প্লাস্টার-প্যারিস করা হয়েছিল দেওয়ালে। দরজা-জানালায় সাদা নেটের পর্দা, যা নিজের হাতে সেদিন লাগাল।

শাড়ি-সংখ্যা কমটম করে ৮০-তো পেরিয়েছিল। এত দিয়েথুয়েও। বাঙ্গালোর, কটকি, কাতান, তানচই, বালুচরি, অর্গান্ডি বা পিওর সিল্কের যেগুলো— বিশেষ করে 'গড়িয়াহাটের মোড়ের শোভা' থেকে কেনা জামদানিটা— আসল ঢাকাই— জর্জেট, ফুল ভয়েল— টাঙ্গাইল— ধনেখালি, ছাপাই শাড়িই খান কুড়ি... ইত্যাদি। সালোয়ার-কামিজ, ম্যাক্সি, নাইটি— এইসব— এরাও ছিল।

এখন তার শাড়ি পরা মানে শুধু নগ্নতা ঢাকা।

অংশ ৩

সে যখন খেতে বসে— কাজের মেয়ে আশা তার সামনে বসে তার হাত ধরে ধরে দেখিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা কী রে, শুক্তো?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'এটা পটল। বাসন্তী দোর্মা করেছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ মাসিমা। এই যে মাছের ঝোল।'

'এ-দুটো' (হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে— যেন পিয়ানোর রিড—) 'পাবদা, না?'

'না-না। বাচা মাছ মাসিমা। পাবদার মতোই। খান আপনি। খান না। আমি তো আছি। কাঁটা পাবেন না।'

একটা ঘণ্টা-বাজা ঘড়ি এসেছে বাড়িতে। বারোটা শুনেছে শেষ। তারপর অনেকক্ষণ বাজেনি কিছু।

'কটা বাজল রে আশা?'

'পৌনে দুটো।'

(বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে):

'কই একটা তো বাজল না?

'বেজেছে মাসিমা। আপনি শুনতে পাননি। মোটে একটা ঘণ্টা তো।'

অংশ ৪

মাছের মধ্যে যেগুলো দেখতে পাবার স্বাদ পাবে না কোনওদিনও আর। প্রথমত ইলিশ— 'জলের রূপালি শস্য'। তারপর বাগদা থেকে কুঁচো চার-পাঁচরকমের, চিংড়ি-গলদা তো চোখ থাকতেই দেখেনি কতদিন— পার্শে, ট্যাংরা, তোপসে, পাকা পোনার মধ্যে মাথাটা সিঁদুরে যেগুলোর তাদের হরিদ্রাভ ডিম, পুঁটি তিন-চাররকমের— এক জাতের পুঁটিতে থাকত কিছু লাল-নীল আঁশ—যেগুলো টকে জমে দারুণ— মাছের আঁশ বাজার থেকে ছাড়িয়ে না আনলে, সে পুঁটি-মৌরলা হোক বা পোনা-পেটি হোক, গোড়ার দিকে কী ভীষণ রেগে যেত সে— আসলে রান্নাবান্না শেখার সময় তো পায়নি।

শাকসব্জি ফলপাকুড়ের মধ্যে তো কত কিছুই— যেন শেষ নেই। তবে সব্জির মধ্যে কচি সজনে ডাঁটা আর ভোরের শিশির-মাখা নতুন কড়াইশুঁটি— রাঁচির বলে চলে যেগুলো— বোঁটাসুদ্ধু পাওয়া যায়। একবার কুমড়ো ফুল এল বাজার থেকে, ওমা, তার বাসরঘর থেকে বেরল কিনা এক নবদম্পতি মৌমাছি। শীতের বন্ধ ফ্ল্যাটে একদম হইচই ফেলে দিয়েছিল। গাছ বলতে ইউক্যালিপটাস। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মিত্তিরবাড়িতে পাশাপাশি পাম গাছ দুটো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে— শীতে, গ্রীষ্মে, বৃষ্টির মধ্যে— মর্নিং স্কুল যাবার পথে ভোরবেলায়— মিনারে নাইট শোয় বাবার সঙ্গে 'ছুটি' দেখে ফেরার সময় অন্ধকারে— সেই ছোটবেলা থেকে তারা দুটিতে একসঙ্গে আর দু'জনের দু'জনকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে কি নির্মম প্রতিযোগিতা! তারপর একটার মাথা ভেঙে গেল ঝড়ে— বাস, প্রতিযোগিতাও খতম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলের কথা উঠলে গাছে ফাটা-আতা— লালবাঁধের আতাবনে ঢুকে সেই একবার। বনি থাকতে। শান্তিনিকেতনে মাসে একবার যেতেই হত। লালবাঁধ ধরে হাঁটতে সেবার ভোরবেলায় কত পাখি— বুলবুলি— কত রকমের— শা বুলবুল, সিপাহি বুলবুল, ঝোটন বুলবুলি— মৌটুসিকে এক ধরনের বুলবুলি বললেই হয়— ঠোঁট এত লম্বা আর বাঁকা যে কল্কে ফুলের ভেতর থেকেও মধু বের করে আনে। সোনা চড়াই-এর গায়ে রোদ লেগে হলুদ ঝিলিক। পায়রা পুষত বটে বোসপাড়ার পুন্টেদা। নোটন, লক্কা, গোলা, গেরোবাজ, মুক্‌কি, ফাকতা— হেন জাত নেই যা ছিল না। তারপর তিতির, বক, কতরকম দোয়েল, ফিঙে, আর আঃ, চিড়িয়াখানার সেই কালো রাজহাঁসটা। লেকের জলে কালো ছায়া ফেলে চিরস্থির। সে যে কখন নড়বে, কেউ বলতে পারে না। নিজেও জানে কি।

সবে ঝকঝকে দোকান খুলেছিল মনজিনিস, রাস্তায় ও ফুটে। কিছুই কেনা হয়নি এক দিনও। জানালায় চড়ুই। চৌধুরি লজের গোল বারান্দায় আইবুড়ো মেয়েটা বিকেলে গা ধুয়ে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকত। চৌধুরিদের বাড়ির ছাদের অ্যান্টেনায় সেই মস্ত দাঁড়কাকটা এখুনি বসল ভেবে টলমল করে ওঠে সে নিজে।

চোখ গেছে বলে সে ধীরে ধীরে কত কিছু শোনাও বন্ধ করে দেবে। রেডিও, রেকর্ড— টিভি তো কিছুতেই না। সে কি শুধু শোনার জিনিস।

ছাদে গেলে, চাঁদ উঠলে টের পাবে কি?

অংশ ৫

'আমি দেখতে পাই না এটা কিন্তু ঠিক নয়, আশা।'

'কী দেখতে পান মাসিমা?'

'মাঝে মাঝে পাই দেখতে। এখন কী দেখতে পাচ্ছি শুনবি?'

'বলুন মাসিমা।'

'বলি?'

'বলুন, বলুন না মাসিমা।'

ধীরে ধীরে আবার বেঁচে উঠছে তার মৃত মুখ।

'বনির বয়স তখন দু'বছর। এই এতটুকুন। দীঘায় একটা নৌকোর ধারে বসে আছি আমরা দু'জনে। যদিও পুজোর সময়, তবে বর্ষা ছাড়েনি। বেশ শীত। একটা বড় মোটা গোলাপি নক্সাদার তোয়ালে জড়িয়ে দিয়েছি ওর গায়ে। বৃষ্টি পড়ছিল বলেই নৌকোর খোলের নিচে আমরা গুটিসুটি মেরে। দাদাবাবু চান করছিল। ওই অবস্থায় হঠাৎ আমাদের দেখে কিটব্যাগের মধ্যে থেকে ক্যামেরা বার করে আমাদের ছবি তুলল। আছে অ্যালবামে, ছবিটা। ছবিটা আছে। তবে তখন যা বলেছিল বনি, সে তো সেখানে নেই। কী বলেছিল জানিস?'

'বলুন না মাসিমা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলল, ঠিক যেমন করে আর কি শেখাই আমরা ওদের— মা, তোমার হাত কই, এই যে। প'? এই যে। চুল? এই যে। কান? এই যে। নাক? এই যে। চোখ? আমি বকবকানি থামাতে ওর দু'চোখ হাত দিয়ে চেপে ধরে বললাম— এই-ই যে। এই যে আমার চোখ। আমার চোখের মণি।' বলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোতে লাগলাম। সে কি খিলখিল হাসি।'

'আপনি কাঁদছেন মাসিমা।'

'তুই কাঠের আলমারি থেকে অ্যালবামগুলো এখুনি নামা। ওই ছবিটা বের কর তো দেখি খুঁজে। এই নে চাবি। দেখবি, একেবারে ওপরের তাকে পরপর সাজানো। সব চেয়ে ছোট অ্যালবামটা। দেখবি বাংলায় লেখা আছে 'পুরী সিরিজ'। আমি একবার হাত রাখব ছবিটার ওপর।'

অংশ ৬

'বনি?'

'বলো মা।'

'তোর বন্ধুদের নাম কর।'

'মণিকা, রাখি, মিমি, অরুন্ধতী, শ্রাবণী—'

'না-না ছেলে-বন্ধুদের নাম বল।'

'পরীক্ষিৎ, অনি, অভি, ছোটন, রোবো, রোহিতাশ্ব—'

'ওরা কেউ তোর গায়ে হাত দেয়?'

'উঁঃ। অম্নি দিলেই হল।'

'কেউ আলাদা ডেকে আদর করে তোকে?'

'কে আদর করবে আমাকে, তুমি ছাড়া?'

'তোকে কিস খেয়েছে কেউ?'

'কিস?'

'ঠোঁটে চুমু। ঠোঁট দিয়ে। কোনও ছেলে?'

'একদিন মাস্টারমশাই আদর করেছিল।'

'আর কিছু?'

'_____'

চুলের মুঠি ধরে, 'বল হারামজাদি। শুধু একদিন?'

'_____'

গালে চড়ের পর চড়।

'বল হারামজাদি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিতে দিতে, 'আর-কিছু। আর কিছু। আর কিছু।'

নিজের মাথা ঠুকে রক্তপাত।

কেস করার কথা উঠেছিল। পুলিসে ডায়েরি। না, অবিবাহিতা মেয়ে। জানাজানি হবে। বিয়ে হবে না। মাস্টারমশাই শিবেনবাবুর খোঁজ হয়েছিল। নিরুদ্দেশ।

কলকাতার মেরি স্টোপস ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল।

একবেলার ব্যাপার।

অংশ ৭

প্রতিভা আরও কী কী দেখতে পাবে না/করতে পারবে না:

শরৎ গ্রন্থাবলী কেনা হয়েছিল। খোলা হয়নি। আর খোলা হবে না।

বই পড়তে, কাগজ পড়তে আর টেলিফোন ডায়াল করতে, টেলিফোন বিল পড়তে, যে কোনও জিনিস খুঁজে না পেলে খুঁজে বের করতে, যেমন বারান্দায় ইজি চেয়ারটা সেদিন গোটানো ছিল, বসতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে কী সর্বহারাই না লেগেছিল সেদিন। 'কোথায় গেল' বলে হাউমাউ আর্তনাদ করে উঠেছিল।

বিছানায় চাদর হয়ত পাততে পারবে। (ঠিকমত না পারলেও এমন কত ভুলই তো সে জানতে পারবে না।) তা বলে, আগের মতো চাদরের কোঁচগুলো হাত দিয়ে সমান করতে পারবে কি আর। আজ কত তারিখ, কাল কী বার, এমনকি এটা কত সাল— জানার প্রয়োজন তার খুব কি হবে? দু'জনের নামে একটা ফিক্সড ভাঙাতে সাতটা সই করতে একটা দাঁড়াল। ব্যাঙ্ক থেকে অফিসার এসেছিলেন। এখন থেকে সই-এর সঙ্গে বাম বুড়ো-আঙুলের টিপছাপও লাগবে। বলে গেলেন।

বাকি জীবন জুড়ে এমন কত জিনিস— শুধু তার লিস্টি দিলেই একটা মস্ত বই হয়ে যাবে। শুধু যে নিজের ব্যাপারগুলো তা তো নয়। অন্যেরা কে কী কিনল, পরল— বনি বিয়ে করলে তার বর— ছেলেমেয়ে সে সবও তো। সবাই দেখে যাবে যা দেখার এবং যা দেখার নয়, এমনকি যা না-দেখলেও চলে— শুধু সে দেখবে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কল্পনাচক্ষু বা মনশ্চক্ষু নেই বলে জীবনভর কত না আপসোস— হয় যে, দুটি ছাড়া মানুষের কোনও তৃতীয় চক্ষু নেই। ছিল না কোনওদিন। শুধু তার নয়। কোনও মানুষের। এ শুধু সে জানতে পারল। সে আর...

পাবে না আহ্লাদ...

মানুষের মুখ দেখে কোনওদিন!

মানুষীর মুখ দেখে কোনওদিন!

শিশুদের মুখ দেখে কোনওদিন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশ ৮

১৯৬৭-তে সে তখন সবে ফ্রক ছেড়েছে। নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর শুরু থেকে বোঝা গিয়েছিল কংগ্রেসের দিন গেছে। দ্বিতীয় দিনে বোঝা গেল কংগ্রেস হেরে গেছে। কঞ্চির আগায় কানা বেগুন আর জোড়া কাঁচকলার পতাকা। নাচাতে নাচাতে সে এক অবিশ্বাস্য মিছিল, লাল পতাকা একটিও ছিল না তখনও। তাদের বৃন্দাবন পাল লেনের সব বাড়ির সদর দরজা হা-হা খোলা— শুধু বারান্দাগুলি নয়— রাস্তায় সব আলো লাল সেলোফেন দিয়ে মোড়া। সে নতুন আলোয় কী রূপবান আর রূপসী দেখিয়েছিল সেই ছোট্ট মিছিলটা— গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছবার আগেই ফুলে-ফেঁপে একসা— রাস্তার দুধার থেকে মিছিলে লোক নেমে পড়ছে টুপটাপ— মেয়েরা আবির ছুঁড়ছে লাল-লাল বারান্দা থেকে— সব লালে লাল হো গয়া! হাতিবাগান বাজারে যে মিষ্টির দোকান থেকে সন্দেশ কিনতেন অতুল্য ঘোষ, তার মালিককে আবির মাখাতে গিয়ে মাঝখান থেকে পুরো দোকানটাই লুট হয়ে গেল। মায়, দই-এর খালি ভাঁড়, আর হাঁড়িগুলো দুমদাম ফাটতে লাগল রাস্তায়।

দুদিন পরে অতুল্য ঘোষ জানালেন কংগ্রেস সরকার করছে না।...

তারপর ... ১০ বছর পরে আর একদিন। ২১ জুন ১৯৭৭। সেই একদিন, একটি দিনের জন্য ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছিল রাইটার্সের সামনে থেকে। রাজভবনে শপথ নিয়ে এসে পরের দিনের সংবাদপত্র যাঁকে ৮-কলম জুড়ে বলবে 'জনগণমন অধিনায়ক'— সেই জ্যোতিবাবু যখন মঞ্চে উঠলেন পাশে আর নেই অজয় মুখার্জির ভূত। তখন তাঁর সামনে একটি জনসমুদ্র, যাতে লেগেছে জোয়ার। সে জোয়ারে উন্মূল, জড়াজড়ি লতাগুল্মের মতো তারাও তো ছিল কোথাও, সে আর বনবিহারী। নাকি তাদের আলাদা কোনও অস্তিত্ব ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল, জালালাবাদের পথ ধরে রুশ ও চীনের কাছে যে ঠিকানা বহুকাল ধরে গচ্ছিত হয়ে ছিল— সেই স্বর্গ-উপকূলে পৌঁছেই মানুষের এ কলরোল। ওই যে সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠছে সোনার ঘণ্টা। ঢঙ্ ঢঙ্ করে বাজল বলে।

মাত্র ৪ জন মন্ত্রীর ক্যাবিনেট। প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং হয়ে গেছে। মাত্র ৫ মিনিটের জন্য ক্যাবিনেট বসেছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মাত্র একটি। সমস্ত বিনাবিচারে আটক ও বিচারাধীন বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।

বিপ্লব হয়ে গেছে। মস্কোর স্মলনি ইনস্টিটিউটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিপ্লবের প্রথম ঘোষণা করছেন কমরেড লেনিন। শুনতে শুনতে একযোগে কেঁপে উঠে জনসমুদ্র গর্জন করে উঠল: ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অংশ ৯

ভোরের রোদের মতো একফালি কাগজ এসে পড়ে থাকবে অন্ধকার বারান্দায়। সে আর তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। মুখ দিয়ে আবার রক্ত উঠলে (১৭ বছরে টিবি) স্বাদে জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে ঠিকই— কিন্তু যেদিন বৃন্দাবন পাল লেনের ভাড়াবাড়ির কলঘরে সাদা বেসিন হঠাৎ যখন লালে-লাল হয়ে গিয়েছিল— কী ভয়ঙ্করই না দেখিয়েছিল। চোখ মুদে এল তখুনি। আজ তেমন হলে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে আর দেখতে পাবে না বলে, দুঃখই হবে। এমন কি মৃত মুখ, যেদিকে কখনও মুহূর্তের বেশি তাকাতে পারেনি— তাও দেখতে পাচ্ছে না বলে মর্মে মরে থাকবে। মাথার সামনের চুলগুলো আরও কত পাকল, মুখে আরও ভাঁজ পড়ল কিনা— এ-সব না-জানতে পারাই তো ছিল ভাল, এতদিন। সে-সব আর জানতে পারবে না। এও কি কম আপসোসের কথা হবে? ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে আর নিজেকে দেখতে পাবে না কোনওদিন।

অংশ ১০

জীবনের মৌলিক অবস্থানগুলো থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া শক্ত। যেমন প্রতিভার চোখের মৃত্যু। কে বলে, মৃত্যুর পরে জীবন নেই? এই তো প্রতিভাও বেঁচে আছে। এবং একটা শুকনো পাতকুয়োর মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে বেঁচে থাকবেও। যাবজ্জীবন। সে কি মানুষ নয় আর!

আজ প্রতিভা কী? না, একা।

একা হয়ে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। গোষ্ঠী-মানুষ ছাড়া কারও চোখ থাকে না। একা মানে অন্ধ।

বনবিহারীকে না বলে যদি তখনই তাকে জানিয়ে দেওয়া হত যে, 'যে কোনও মুহূর্তে আপনার রেটিনা টসটসে লাল হয়ে যাবে, এমনকি রক্তও পড়বে চোখের কোল বেয়ে আর তারাদুটো হয়ে যাবে স্থির—' এবং তখন যদি তাকে আরও বলা হত, 'অতএব আপনি এখন থেকেই যা পারেন চুটিয়ে দেখে নিন, মিটিয়ে নিন দেখাদেখির যত সাধ-আহ্লাদ—' তাই কি পারা যায়, না যেত?

মানুষ মনে করে সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, শুধু দুটি চক্ষু-সম্বল সত্যিসত্যিই সে কতটুকু দেখতে পায়? তৃতীয় চক্ষুর প্রশ্ন জড়িত। তার অভাবে জড়িত জন্মান্ধতার প্রশ্ন।

মানুষ— সে তো এক জন্মান্ধ আবেগ। তার প্রকৃতিই হল সে যা নয় তাই হতে চাওয়া আর সে যা, তা না হতে পেরে বেঁচে যাওয়া। সে তো কিছুতেই মানবে না, তার পক্ষে প্রভু ও দাস অনুচর পার্শ্বচর সত্যবাদী মিথ্যাবাদী, প্রেমিক ও অপ্রেমিক— সন্তান, বাবা, স্বামী— এককথায় হেঁজিপেঁজি থেকে কাগাবগা কিছুই হওয়া সম্ভব নয়— কারণ, এর কোনওটাতেই তাকে পুরোপুরি মানায় না— কারণ, এগুলোর একটিতেও তার আদ্যন্ত বিশ্বাস নেই— আমৃত্যু তবুও সে এইসব চেষ্টায় লেগে থাকবে। জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই জেনেও প্রেম করে যাবে। সন্তানের মুখে চুমো খাবে। মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে এ-ভাবে তাকে জড়িয়ে থাকতেই হবে। নইলে সে হারাবে বিশ্বাসযোগ্যতা। মানুষের কাছে। এবং নিজের কাছেও। একা হয়ে যাবে। একা হলে অন্ধ হয়ে যাবে। জন্মান্ধের অন্ধ হয়ে যেতে তাই এত ভয়। একা মানুষের একা হয়ে যেতে।

এ-ভাবেই, শুধু বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবার ভয়ে, তাকে বলে যেতে হবে আমি সব দেখতে পাচ্ছি। ভোট দিয়ে মিশে যেতে হবে জনমতামতে। যদিও তৃতীয় চক্ষু থেকে প্রবঞ্চিত বলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে জন্মান্ধ। তাই সে চোখ থাকতেও কানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য/৬

অংশ ১

পথিক পারে না পথ ছেড়ে যেতে। কিন্তু ঔপন্যাসিক যেন দেওয়ালের ঘুলঘুলি থেকে বেরনো মাকড়সা, যেখান দিয়ে যাবে সেটাই তার রাজপথ। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক—— এঁরা কী না পারেন? এমন উপন্যাস তো কতই লেখা হয়েছে, অঙ্গহানি দূরস্থান, যাতে চরিত্রগণের একটিবার জ্বরজারি বা সর্দিকাশিও হয়নি। মৃত্যুর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর সেদিক থেকে তারা একপ্রকার অমরই থেকে গেছে বৈকি।

যেমন, পুতুল নাচের ইতিকথায় ডা. শশী দাস। গাওদিয়া গ্রামের মেঠো পথে সে তো আজও ভাক্তারি বাক্স হাতে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য নাট্যকার মেরে ফেললেই যে মৃত্যু, তাও নয়। ওফেলিয়া তো উইলো গাছের নিচে দিব্যি ভেসে আছে, যদিও শ্বেতরাজহংসিনী রূপে।

তো, কী না পারেন ঔপন্যাসিক? তাই বলছিলাম, সুধী পাঠক, এবার আসুন, শুধু একটা নড়বড়ে সিঁড়ির কথা ভাবি এবং সেখান দিয়ে উঠিয়ে এনে প্রতিভাকে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড় করাই। ওই দেখুন, হাতড়ে হাতড়ে সে কড়াটা খুঁজে পেল না, কারণ ভাঙাচোরা দরজা থেকে কড়াটা বহুদিন হল খসে গেছে। ওই দেখুন, ফলত, ছোট ছোট কিল মেরে সে দরজায় করাঘাত করছে। না, প্রতিভা কী করে কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে বস্তির মাঠকোঠায় এল, এ ভাঙাচোরা দরজার সামনে কে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল, এ-সব কোনও প্রশ্ন নয়।

এ-সব ঢের হয়েছে।

অংশ ২

'এসো। বোসো প্রতিভা। না-না অবাক হয়েছি ভেবো না।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'বরং বেশ ঠিক-ঠাক লাগছে।'

'আলো জ্বালাওনি কেন?'

আলো? ও-হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। বাইরে কি অন্ধকার হয়ে গেছে?'

আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? আলো না জ্বললে আমি টের পাই। কিন্তু অন্ধকার——'

'চা করব?'

'ব্যবস্থা আছে?'

'হ্যাঁ। ওটুকু—'

'টিউশন করে চালাও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। ওতেই চলে যায়।'

'পার্টি?'

'কোন পার্টি? পার্টি কোথায়?'

'লেখালিখি করো!'

'সে-সব নয়। 'লিন পিয়াও তত্ত্বের প্রয়োগ ও গেরিলা অ্যাকশন' নয়। যা লিখছি শুনলে হাসবে। উপন্যাস।'

'নাম রেখেছ কিছু?'

'কার?'

'উপন্যাসের?'

'হে পাবক, তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে'।

'এ-ভাষা তুমি পেলে কোথায়? এ তো জানতে না?'

নিস্তব্ধতা।

'চা করব।'

'না। তবে আমি চা করতে পারি। আগুনের কাছে যাই না অবশ্য। আশা জল ফুটিয়ে দেয়। বাকিটা আমি করতে পারি। সত্যি, হাত দিয়ে ছুঁয়ে যে এত জিনিস দেখা যায় আগে জানতাম না। আজ মনে হয়—'

নিস্তব্ধতা।

'আজ কী মনে হয়?'

'বরং আগেই কিছু দেখতে পাইনি।'

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'কাছে এসো। ছুঁলেই সব দেখতে পাব। এই খবরদার না, কাছে আসবে না। যেখানে বসে আছো থাকো। আমি সব দেখতে পাচ্ছি!'

'কীসের ভয় তোমার প্রতিভা? এখনও?'

'ভয়? হাঃ-হাঃ। হাসালে! অনেকদিন পরে হাসলাম। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ব্যভিচারিণী হতে ভয় নেই?'

'চোখ হারিয়ে, এখন তোমাদের মতো চোখওয়ালাদের চেয়ে স্ট্যাটাসে আমি কত বড় তা জানো? আমি কি ওসব নিয়ে আর ভাবতেও পারি তুমি মনে করো। তাহলে আসতে পারতাম? আমি তো কিছু থেকে কিছু আর তফাত করতে পারি না। আর তার মধ্যে ভাল-মন্দও পড়ে। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন, জানো না তুমি?'

'তুমি কেন এসেছ প্রতিভা?'

'চলে যেতে বলছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-না। একদম না। তবু। কেন এসেছ তুমি। আজ এত বছর পরে! একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তাই তো এসেছ?'

'তুমি শেষবার দেখা করতে বলেছিলে। আমি সেই শেষবার এসেছি।'

'২০ বছর পরে?'

'২০ বছর পরে।'

'তখন বলার কিছু ছিল প্রতিভা। কিন্তু সে তো ২০ বছর আগে।'

'কী বলতে তুমি তখন! কিছুই না। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করিনি কেন জানো? কারণ কিছুই তোমার বলার ছিল না, তখন। আমাকে।'

'তুমি বড় জোর আমার দল থেকে তোমার দলে আমাকে নিয়ে যেতে। তোমার কাছে আমি ছিলাম স্রেফ একটা পার্টির মেয়ে। আর আমার তখন হঠাৎ দরকার গোটা জীবনের জন্যে একটা প্রতিশ্রুতি। বাপের বাড়ির পার্টি থেকে শ্বশুরবাড়ির পার্টি। একটা ছোট্ট কারাগার। আর তার ফটকই বনবিহারী আমাকে দেখাল। যখন বাবার মৃত্যুর সৎকারের খরচও বাড়িতে নেই আর আমার বিয়ের বয়স আমাকে হাই তুলে বলল, চলি রে।'

'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'ভাল।'

'তোমার মেয়ের নাম কী?'

'বনলতা। বাবা সেন। নাম আর কী হতে পারত বলো?'

'বাইরে আছে?'

'হ্যাঁ, পুনেতে।'

'কী পড়ছে?'

'সিনেম্যাটোগ্রাফি। ওর বাবাই ঢোকাল দিল্লির পার্টিকে ধরে।'

নিস্তব্ধতা।

'ফোন করে সপ্তাহে একদিন। সেদিন আমি বললাম, খুব ঠাণ্ডা লেগেছে রে। জ্বর হয়েছে। শুনে বলল, কী যে করো। সাবধানে থাকো না কেন?'

'লেখাপড়া কেমন করছে?'

'ছাই করছে। শুনছি তো সব ছেড়েছুড়েই দিয়েছে। ক'মাস আগে ফোন করে বলল, মা একজনের সঙ্গে কথা বলবে। বললাম, কে রে। বলো না! ছেলেটি কথা বলল। শুনেটুনে ও গিয়েছিল পুনেতে। ছেলে কোথা। ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। লেকচারার একজন। বিবাহিত। ছেলেমেয়ে আছে। নাম ডা. অরবিন্দ তোপে। তাঁতিয়া ছাড়া আর কেউ তোপে হয় বলে তো জানি না বাবা। ওরা লিভ টুগেদার করছে। ও নিজে দেখে এসেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশ ৩

ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়, তাই সে রাতে প্রতিভা আমার কাছেই থেকে গেল। বাড়ির নিচে মুসলিম রেস্তোরাঁ থেকে এল বিফ কাবাব আর পরোটা। কলুটোলা বস্তির পেটের ভেতর পেটমোটা কামালের সাইনবোর্ডহীন মস্ত চাটু থেকে কাবাবের গন্ধ কত সহজে ২০ বছর পেরিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে।

রয়েড স্ট্রিটের বস্তির মধ্যে আমার এই ছোট ভাঙাচোরা ঘরখানা আজও তার জন্য অপেক্ষা করে আছে দেখে প্রতিভার মুখে প্রচ্ছন্ন গর্বের ছটা আমি দেখতে পাই।

যূথভ্রষ্ট দুটি পিঁপড়ে। আর তো কথা ছিল না দেখা হবার। চলার পথও হয়ে গিয়েছিল আলাদা। তবু হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তারা যেমন দাঁড়িয়ে পড়ে, শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে কয়েক লহমা ধরে বিনিময় করে নেয় তাদের একলা চলার অভিজ্ঞতা অথবা ভূত ও ভবিষ্যৎ— তেমনি মনে হল আমাদের সে-রাতে— যে পৌষের এ-রাত বুঝি ফুরোবে না। সারারাত ধরে কত কথাই না বললাম আমরা দু'জনে। কর্পোরেশনের লরি এসে দাঁড়াল। হাতে-ঠেলা জঞ্জাল-গাড়ি ঢুকল বস্তির মধ্যে। আমরা তখনও জেগে। তারপর প্রথম ট্রাম ছুটে আসে ট্যাং-ট্যাং শব্দে। লটর-পটর আর দুটি বগির ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে বোঝা যায় ট্রাম একদম খালি। প্রায় আরোহীবিহীন এই ট্রাম এত দ্রুতগতিতে ছুটে যায় যে মনে হয়, পুরনো জং-ধরা লাইন আর রাস্তার খানাখন্দ ছেড়ে সে বুঝি বরং কুয়াশাকঠিন ঘুমন্ত ফুটপাথে উঠে মুখ থুবড়েই পড়তে চায়।

জায়গাটার নাম রামেশ্বর।

লোধাশুলি আর জামশুলির মাঝখানে সুবর্ণরেখার ওপর নতুন ব্রিজ তখনও তৈরি হয়নি। পুলিস বলো, মিলিটারি বলো, বিপ্লবী বলো, পারাপার নৌকোয়। তারপর গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে, পেরিয়ে মাইল-মাইল শালের জঙ্গল, তুমি পৌঁছবে গণফৌজ দিয়ে ঘেরা মুক্তাঞ্চলের সেই নির্জন রাজধানীতে। সুবর্ণরেখার প্রায় মোহানার কাছে পরিত্যক্ত সেই বিশাল জগন্নাথ মন্দির, সঙ্গে দুধপুকুর। বেলেপাথরের স্ল্যাব দিয়ে বাঁধানো পুকুরের পাড় ও সিঁড়িশ্রেণী। জায়গাটার নাম রামেশ্বর। সেটাই ছিল মুক্তিফৌজের হেড কোয়ার্টার। কলকাতা থেকে আমিই প্রথম যাই ওখানে। পার্টির নির্দেশে গেরিলা-বাহিনী গড়ে তুলতে। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার কিছু কমরেড এলেন। বিহার ও ওড়িশারও কেউ কেউ।

গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার পক্ষে, দু'একদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম, এর চেয়ে আদর্শ এলাকা হয়ত কমরেড হো-চি-মিনও পাননি। ওপারে ওড়িশা। ছেলেমেয়েরা নৌকো চেপে হাইস্কুলে পড়তে যায় ওখানেই। সেটাই কাছে হয়। ওপারে ই এফ আর জমলে, তারাই খবর আনে। যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় লুকিয়ে পড়ার। ঝাড়গ্রাম দিয়ে এলেও সেই নদী পেরতে হবে। আমাদের ইনফর্মার মাঝিরা। বিহারে সরে পড়াও কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

গল্প কি একটা। গল্প শুনতে গেলে তো হাজার এক আরব্য রজনীও যথেষ্ট হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল, বলি তোমাকে। কমরেড গুণধর মুর্মুকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যে ডেবরার বীর কৃষক গেরিলারা দিনের আলোয় টাঙ্গির ঘায়ে সাবাড় করল কংগ্রেসি জোতদার মৈনুদ্দিন মল্লিককে। আমড়ুবি হাট থেকে ফেরার পথে টাঙ্গির একটা ঘায়েই মাথাটি তার ধড় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ল। পড়ে ছিল দু'দিন, দুই রাত্রি। দেখুন শ্রেণীশত্রুরা। বুঝুক। শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চেহারা দেখুক লাল সন্ত্রাসের।

না-না, এটা, কোনও মজার ব্যাপার নয়। মজার ব্যাপারটা হল, ওড়িশা দিয়ে নদী পেরিয়ে ই এফ আর যখন রামেশ্বরে ঢুকল, তখন হল কী জানো? একটা ঝুড়িতে আমাদের কিছু তাজা বোমা রাখা ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এদিকে একটা নেংটি ইঁদুর ঢুকে পড়েছে ঝুড়ির মধ্যে। তারই ঠেলাঠেলিতে একের পর এক বোমগুলো ফাটতে থাকে। তারা তখনও তীর ছেড়ে পাড়ে ওঠেনি। রাইফেল কাঁধে কাদা ভেঙে হারামজাদাদের পালাবার ছবিখানা যদি দেখতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। ভাবলে আজও হাসি পায়। গ্রাম ভেঙে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দুয়ো দিচ্ছে; গাঁয়ের মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দিচ্ছে 'উলু-লুলু-লুলু', সত্যিই হাস্যকর দৃশ্য। কাগুজে বাঘও নয়। এরা যে কাগুজে ইঁদুর— সেদিনই বোঝা গিয়েছিল।

ওখানে স্টেপল্ ফুড বলতে কী জানো। শুনলে হাসবে। মেনলি গুড়। এই অ্যাত্তোখানি গুড় খেতে দেবে তোমাকে প্রথমেই। সঙ্গে এক কাঁসি সাইজের ছোট্ট ধামায় করে মুড়ি। নভেম্বর থেকেই সারা শীতকাল গুড়ের গন্ধে ম'ম' করে বাতাস। ওখানে। নেশা ধরে যায়।

আমি যখন প্রথম যাই, সেটা ছিল জষ্টি মাস। প্রচুর, প্রচুর আমবন ওদিকে, বুঝলে। গাছের পাতা-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে তখন থোকা থোকা কাঁচা আম— একদম ডাঁসা। এরপর একদিন হয়েছে কী কম্যান্ডার কানাই কুঁইতির (পরে শহিদ) ছেলে বলাই পাঠশালা থেকে ফেরার পথে দেখতে পেয়েছে গাছের পাতার ফাঁকে একেবারে ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, একটা নয়, দুটো নয়, এক থোকা সিঁদুরে পেয়ারাফুলি। আর যাবে কোথা। যেই না দেখা, ছেলে 'আম পেকেছে', 'আম পেকেছে' বলে ছুটতে ছুটতে গ্রামে ঢুকল। 'পথের পাঁচালি' ছবিতে 'চিটি' 'চিটি' বলে অপুকে পোস্টকার্ড হাতে ছুটতে দেখেছ তো? তেমনি। পশ্চিম বাংলার এইসব নিস্তেজ, নিভৃত, বিচ্ছিন্ন গ্রাম, এখানে লেটারবক্স নেই। তবু চিঠি আসে। যখন আম পাকে। আর শহিদ কানাই কুঁইতির পাঠশালা-ফেরত ছেলে তখন এ-ভাবেই 'চিটি' 'চিটি' বলে ছুটে আসে।

সেদিনই বিহার থেকে এসেছেন কমরেড শ্যামানন্দ মিশ্র। এই দৃশ্য দেখেছিলেন। সন্ধ্যাবেলার মশাল-জ্বালা গেরিলা-বাহিনীর মিটিং। তিনি বললেন, কমরেডস, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০। এই তিন বছরে নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি পি আই এম-এল পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শ্রীকাকুলামে ৩৫০ গ্রাম নিয়ে কায়েম হয়েছে ভারতে জনগণের প্রথম লাল রাজনৈতিক রাজ। ১২০০০ সি আর পি এই মুহূর্তে ঘিরে আছে সেই লাল মুক্তাঞ্চল। কমরেড ভেম্পাতাপু সত্যনারায়ণের নেতৃত্বে, কমরেড মাও-সে-তুং ও কমরেড চারু মজুমদারের চিন্তাধারায়— সেই ঘেরাও ভাঙা সম্ভব হয়েছে। মোট ১২০ জন পুলিস খতমের পর তারা এখন ছত্রভঙ্গ। শুধু শ্রীকাকুলাম নয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর নেতৃত্বে একের পর এক গেরিলা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে সুদূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্জাব থেকে আসাম, উত্তরপ্রদেশে— মাদ্রাজ ও কেরালার উপকূল পর্যন্ত নকশালবাড়ির আগুন জ্বলছে।

আমাদের লড়াই বর্গাদারদের জন্য মার্কসবাদী ভূ-দান আন্দোলন নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোয় লাল রঙ লাগিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন বলে চালাবার চেষ্টা নয়। শুধু গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, রামেশ্বরের কৃষকরা জোতদারের ধান কেটে গোলায় ধান তোলেনি, আমার মুঙ্গের জেলার শতশত কৃষকও ধান তুলছে এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা তা রক্ষা করছে। আমাদের লড়াই শুধু জমি দখলের লড়াই নয়, কমরেড চারু মজুমদারের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করবার লড়াই। এ লড়াই জনগণের জন্য, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। আর বন্দুকের নলই, আমরা মনে করি, সেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

'কমরেডস, আজই এল সেই সুসংবাদ। গেরিলাদের সদর ঘাঁটি রামেশ্বরে প্রথম আম-পাকার খবর। খবর এনেছে শহিদ কানাই কুঁইতির শিশু-সন্তান বলাই কুঁইতি। এখন সব গাছে আম পাকবে। একে কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু কমরেডস, আপনারা জানেন, আম এমনি পাকেনি। এজন্যে প্রয়োজন হয়েছে চাঁদি ফাটানো গরম, মাটি থেকে সার, মাঝখানে বৃষ্টিও হয়ে গেছে।' গভীর ও নিরুদ্ধ আবেগময় গলায় কমরেড মিশ্র শেষ করলেন— 'বিপ্লবকে কেউ রুখতে পারবে না। পারেনি কোনওদিন। একজন বিখ্যাত বিপ্লবী বলে গেছেন, বিপ্লব দরকার হলে ঘোড়ার পেটে লুকিয়ে থাকবে— এবং সেখান থেকে বেরুবে যখন সময় হবে। কিন্তু কমরেডস, আম গাছের মতো বিপ্লবের গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হলেও দরকার সার ও সেচের। আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ, সেই সার কোথায় আছে জানেন কি? সেই সার আছে জোতদারের আর শ্রেণীশত্রুর রক্তে। আর তাদের যারা রক্ষা করে সেইসব প্রহরীদের রক্তে।'

কতদিন হয়ে গেল, কত বছর। আজও চোখের সামনে ইচ্ছে হলেই ভেসে ওঠে... ভোরের আলোয় কৃষকের মেয়ে-বউরা জোতদারের ধান তুলে নিচ্ছে রামেশ্বরের মাঠ থেকে— পাহারা দিচ্ছে তীর-ধনুক কাঁধে আর টাঙ্গি হাতে আমার নিজের হাতে গড়া গণফৌজ— কানাই কুঁইতির নেতৃত্বে। তার কাঁধে বন্দুকের নল। যখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গোপন পথে নদী পেরিয়ে সারারাত হাঁটিয়ে সি আর পি নিয়ে স্বয়ং হাজির হল মৈনুদ্দিন মল্লিক। শহিদ হল কানাই কুঁইতি-সহ আরও দু'জন। মৈনুদ্দিনের মাথা কাটার সিদ্ধান্ত সেদিনই নেওয়া হয়।

অংশ ৪

বিপ্লবের জন্য কোনও প্রয়াসই কখনও ব্যর্থ হয় না, প্রতিভা। কোনও না-কোনও দিক থেকে তার সার্থকতা জেগে থাকে। ওই যে বলে না, দে গরুর গা ধুইয়ে! ঠিক তাই। মাঝে মাঝে ধুইয়ে দেবার দরকার হয়। আর সেটাই বিপ্লব। পার্টি মরে যায়, স্পার্টাকাস থেকে চারু মজুমদার— চে গুয়েভারা — সবাই মরে। এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু হয়। শুধু বিপ্লব মরে না।

তাহলে তো ফরাসি বিপ্লব ব্যর্থ, তেলেঙ্গানা ব্যর্থ! ৪০০০ কৃষক শহিদ হয়েছিল তেলেঙ্গানায়। তারা ব্যর্থ? ফরাসি বিপ্লবের নায়ক দাঁতোকে গিলোটিনে নিয়ে যাচ্ছে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে--

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুধারে বোবা বুভুক্ষু মানুষের সারি— দাঁতো কী বলেছিল জানো? বলেছিল, গলা কাটার পর যা যা বলার আমার শরীর বলবে। তাঁতিয়া তোপেও ঝোলবার আগে এই কথা বলে থাকবে। অন্তত ভাবেনি কি? তুমি কী বলো!

সরোজ দত্তর মৃত্যু। ৫ আগস্ট ১৯৭১। স্বপ্নে দেখা একটা ছবি ফুটে ওঠে। সত্যি কিনা জানি না। দুঃস্বপ্নও বলতে পারো। দুঃস্বপ্নও তো দেখি আমরা। আর তাও তো সত্যি, অন্তত স্বপ্ন দেখার সময় কেউ তো অবিশ্বাস করি না। আমি দেখি: কলকাতার ময়দানে কোথাও, পিছ-মোড়া অবস্থায় উনি হাঁটু গেড়ে বসে। গুলি মাথায় করা হয়ে থাকলে শব্দ শুনতে পাননি। শব্দের গতি দিয়ে রিভলভারের নল ও রগের দূরত্বহীনতাকে ভাগ করলে তাই দাঁড়ায়। কিন্তু তার আগে উনি যে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলে যাননি তা কি তুমি জোর করে বলতে পারো।

(প্রতিভা হাত বাড়িয়ে আমার হাত খুঁজে নিয়েছে। আমার হাতে মাথা তোলা রোঁয়াগুলো সে বিছানার চাদরের কোঁচের মতো মসৃণ করে দিতে থাকে।) এমন কোনও বিপ্লব হতে পারে বা কখনও হয়েছে যাতে প্রতিবিপ্লব ফেউ-এর মতো লেগে থাকেনি বা থাকবে না?

বলো কবে? একে যদি ব্যর্থতা বলো, তাহলে আজকের কেরিয়ারিস্ট বামপন্থা সংশোধনবাদীদের পিলার অফ সাকসেসের চেয়ে, মানতেই হবে, সেই ব্যর্থতার স্তম্ভ মাথাটা বেশ কিছুটা উঁচুতেই রাখতে পেরেছে। আমাদের আন্দোলনে কতজন শহিদ হয়েছে? শুধু তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের শহিদ ৪০০০। সেটাও কি প্রতিবিপ্লব? ৪৬-৪৭-এর তেভাগা আন্দোলন? আমরা তো সেই লাল ঝাণ্ডাই আবার তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। আমাদের বিশ্বাসে ভুল ছিল কোথায়? (আমি প্রতিভার মাথায় চুলে মুখ রাখি এবং গালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। আমার নরম ছোঁয়া ওঠা-নামা করে তার খুলে দেওয়া চুলে।) তোমার শুধু একদিনের জন্য স্বাধীনতা যেদিন তুমি ভোট দেবে— বাকি পাঁচ বছরের জন্যে স্বাধীনতা আমার— বিপ্লব কখনও এ-কথা বলে না। বিপ্লব বলে না, তুমি থাকবে নিরস্ত্র— আর আমার হাতে থাকবে অস্ত্র। আমরা একথা মানিনি। আর এই স্বাধীনতা আসতে পারে শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই। বিপ্লবের পর বিপ্লব ব্যর্থ হতে পারে, তবু বিপ্লব করার অধিকারই মানুষের একমাত্র অধিকার। হ্যাঁ, একমাত্র। কারণ, বিপ্লব মানে স্বাধীনতা। বিপ্লব এমন কোনও রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করে দেয় না যা চিরকালের জন্যে। তাহলে তো তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ! তাই, বিপ্লব এমন কোনও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেয় না, যা প্রকাশ্যে অথবা লুকিয়ে জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করে। আর এই স্বাধীনতা শুধু অর্থনীতির আর সামাজিক স্বাধীনতা নয়। বিপ্লব এমন কোনও বিপ্লবী সংবিধানও রচিত হতে দেয় না, যা অচ্ছেদ্য এবং অদাহ্য। বিপ্লব মানে তাই যুদ্ধের শেষ নয়, যুদ্ধের আরম্ভ। আর যুদ্ধ মানে, এমনকি কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধও— যুদ্ধ মানেই হত্যা, হিংসা আর রক্তপাত। প্রতিটি বিপ্লবীর হাতে তাই অস্ত্র থাকতেই হবে। হাতে রক্ত লাগতেই হবে। যার হাতে শ্রেণীশত্রুর রক্ত লাগেনি সে বিপ্লবী নয়। একদম খাঁটি কথা। এই সরল সত্য প্রতিটি বিপ্লবীকে বুঝতে হয় যে জনগণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা শুধু বন্দুকের নল থেকেই বেরিয়ে আসে। এরমধ্যে এতটুকু ভুল নেই।

(এখন প্রতিভার মাথা আমার বুকে। ওকে আরও কাছে টেনে নেবার জন্যে আমার কোনও আগ্রহ নেই। ওর হাতদুটি আমার দুই কাঁধে এলিয়ে রয়েছে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপের গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীটা, মার্কস বলেছিলেন, বিপ্লবের লিট-মোটিফ। সেই মোটিফ দিয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর যত মুক্তি আন্দোলন, যত ব্যর্থ বিপ্লব, সে-সব দিয়েই তো তৈরি হয়েছে ২০ শতাব্দীর মুখ। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে কত সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র— কেড— এমনকি মার্কস-এঙ্গেলসও যেন পৃথিবীর নতুন নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আর পারছে না— অন্তত পুঁথিগতভাবে। কিন্তু বিপ্লব ? সে এখনও সমস্ত রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত চিন্তার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ওই দ্যাখো, আর থাকবেও। ঠিক যেমন আগুন। যেন মণিকর্ণিকার বহ্নিমান চিতা। ইতিহাসের সমস্ত বিবর্তনকে সেখানে আসতেই হবে পুড়ে ছাই হয়ে নতুন জন্মের জন্য।

অংশ ৫

সুধী পাঠক, এইসব কথা এত বাঙ্ময়ভাবে তাদের মধ্যে হয়েছিল কিনা তা অবান্তর। তবে, অন্তত একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন প্রাণের হাত ('আমাকে প্রয়োজনে প্রাণ বলে ডাকুন') ধরে টপটপ করে ঝরে পড়েছিল প্রতিভার অশ্রু, তার কালো চশমার ফাঁক দিয়ে। অন্ধ নারীর অশ্রুপাত, সে বড় সহজ জিনিস নয়। প্রাণ তাকে বুকে টেনে না নিয়ে পারেনি। শুধু তাই নয়। সে অবাক হয়ে দেখল সংশোধনবাদিনীর মুণ্ডুকে আরও বেশি করে গ্রহণ করার জন্য তার বুকে একটা খোঁদলের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘরে বিছানা ছিল একটা। শীতের দাপট ছিল এত বেশি যে দুজনকেই একমাত্র লেপের সাহায্য নিতে হয়েছিল। গিলোটিনের দিকে যেতে যেতে জর্জ জ্যাক দাঁতো যা বলেছিল সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

দৃশ্য/৭

অনেক হল। অনেক, অনেকদিন হল। বই-সময়ের বহু বছর কেটে গেছে। সুধী পাঠক, এত দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কাহিনীর সঙ্গে থাকার জন্য'আবার আপনাকে নমস্কার জানাই। আপনি যথার্থই টের পেয়েছেন, এই কাহিনীতে এখন মোহানার টান। পৃথিবীর কথাসরিৎসাগরের কোথায় পড়ে এ অকিঞ্চিৎকর কাহিনী কোথায় মিলাবে, আপনি কেন, সুধী পাঠক, স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরও তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে তার আগে, আপনার অনুমতি নিয়ে সুধী পাঠক, চলচ্চিত্র ছেড়ে, এবার একটি স্থিরচিত্রে আলোকসম্পাত করতে চাই। চলচ্চিত্র ভাষায় বলতে গেলে এই বিগ ক্লোজ-আপটি আপনার অক্ষুণ্ণ মনোযোগ দাবি করে।

এ কী, এ কী। এ কী দেখছি। এ যে সেই বাথরুমটা। সিলিং-পর্যন্ত অফ-হোয়াইট ঢোলপুরি মার্বেল। মেঝেরগুলো দেড়-বাই-চার করে এক-একটা। স্নানের জায়গা আলাদা, এখন ধোঁয়াটে কাচ দিয়ে পার্টিশান করা (সেই প্লাস্টিকের পর্দা আর নেই)। সাদাছিট কালো পাথরের স্ল্যাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝখানে বসানো প্রকাণ্ড ও গোলাকার দুধসাদা বেসিন থেকে সাপের ফণার মতো মাথা উঁচু করে ঠাণ্ডা-গরম দুটি ট্যাপ— তাদের মাথায় লাল আর সাদা টিপ। বেতের ট্রে ভর্তি কসমেটিক্স— নতুন বলতে সুগন্ধি ব্রুটের শিশিটা, ব্রুটের অত বড় শিশি ফ্যান্সি মার্কেট ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। শেষবার ফ্ল্যাশ টানার তোড়ে হারপিক কেক থেকে বেরিয়ে প্যানের জল এখনও নীল, তবে ফেনা নেই। ডেট-ক্যালেন্ডারের চীনে ঘাসের ডগায় বাষ্পও জল হয়ে জমে নেই এখন। শুকনো ও খটখটে বাথরুমটি দু-একদিন ব্যবহৃত হয়নি বলেই মনে হয়।

এখন ভোরবেলা। রাস্তার উল্টোদিকে নতুন শপিং কমপ্লেক্সের দোতলা উঠছে। সামনে স্তূপাকার খোয়া, আর বালি। একগাড়ি ইট ফুটপাথে সাজানো। বাঁশের ভারার একেবারে ওপরের দিকে একটা কড়ে-আঙুলে বুলবুলি টুই-টুই-টুই-টুই করে উত্তেজিতভাবে ডাকছে তো ডেকেই চলেছে। অতটুকু সুরযন্ত্র থেকে এত অনর্গল শব্দ?

বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে সে কি কিছু দেখতে পেয়েছে?

প্যানের ওপর মুখ, ছিট কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরা একটি কমবেশি বছর-কুড়ির মেয়ে মরে পড়ে আছে। মুখটি প্যানের মধ্যে ঢুকে যাবার আগে কেউ যেন লাগাম টেনে ধরেছিল। সে-ভাবে উঁচু। তার কষে ফেনা।

দৃশ্য/৮

অংশ ১

কাল রাতে ওরা বাড়ি ছিল না। নতুন মারুতি জেন দেখাতে বনবিহারী গিয়েছিল ভগ্নীপতি অজয়ের বাড়ি। অজয় বামপন্থী কনট্রাক্টর। হু থেকে যে ৫০০ কোটি টাকার মতো এসেছে হাসপাতালগুলোর উন্নতির জন্যে, তার একটা ছোট্ট অপভ্রংশ সে পেতে চায়। টেন্ডার চেয়ে বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। সেই নিয়েও কথা ছিল। প্রতিভা যায় না কোথাও। তবে নতুন গাড়িতে ননদের বাড়ি যাবার প্রস্তাব সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। খানার চেয়ে পিনার বহরই ছিল বেশি— আগাগোড়া ব্ল্যাক লেবেল— নেশা এত হয়ে গেল যে গাড়ি চালাবার ক্ষমতাই থাকল না। ওরা থেকে গিয়েছিল।

রাতে ফোন করা হয়েছিল আশাকে। কথা বলেছিল। সকালে অবশ্য রিং হয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল, পাড়ার সব ফোন খারাপ। কেব্‌ল ফল্ট। ওদেরটাও চোখ বুজেছে।

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ বুঝতে পারেনি কেউ। না বনবিহারী, না প্রতিভা। ফ্ল্যাট বন্ধ করে আশা মাদার ডেয়ারিতে গেছে মনে করেছিল। বাজারেও যায়। ওর কাছে আলাদা চাবি থাকে।

বাথরুমে গিয়ে প্রতিভাই প্রথম টের পায়। সে হাউমাউ করে ওঠে। প্রতিভা বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি দেয় না। বনবিহারী দরজা ঠেলে ঢুকে দেখে, প্রতিভা তাড়াতাড়ি ম্যাক্সি গলাচ্ছে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁক দিয়ে সে প্যানের ওপর আশার উপুড় শরীরের সরু নূপুর-পরা গোড়ালি দুটি প্রথম দেখতে পায়। বমি করতে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

অংশ ২

ওদের বাড়ির ফোন সত্যিই ডেড।

'দাঁড়াও আসছি আমি' বলে লিফটের বোতাম টিপে লিফট ওঠার সময়টুকুও নষ্ট না করে দুদ্দাড় বেগে নেমে বনবিহারী সবচেয়ে কাছের এস টি ডি বুথের সামনে দাঁড়ায়। যখন ফোন তুলল, তখনও মনের জোরে হাঁটু দুটিকে ঠোকাঠুকি থেকে বিরত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু অম্বুজের ওখানে অনেকক্ষণ ধরে রিং হবার সময় তার হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো হয়ে গেল শুধু মাংসের— এবং হাড় বিনা তারা চাইল তাকে নিয়ে বসে পড়তে।

অম্বুজ নর্থ ২৪ পরগনার ডি আই জি। ৭০-এর দশকের ব্যাচমেট প্রেসিডেন্সিতে। পার্টি না করলেও ক্লোজ সিমপ্যাথাইজার তো ছিলই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। বিশেষ করে পরের দিকে। বনবিহারীর ২৪ পরগনার জেলা পার্টিতে যাবার পর। আপদ-বিপদে তারই দরকার হত বেশি।

অম্বুজ বলল, 'থানায় খবর দিয়েছিস?'

'না।'

'সে কী রে। আগে থানাকে জানা।'

'তুই এসে দাঁড়া। আমি বড্ড ভয় পেয়েছি।'

'ভয় কী তোর। তুই তো বাড়িতেই ছিলিস না। এ-রকম মরে-টরে যেতেই পারে। কীভাবে মরল ডাক্তার এসে বলুক। ডেথ সার্টিফিকেট দিক। পুলিস আসুক।'

'তুই একবার পারবি না আসতে?'

'আমার যাবার দরকারটা কী বল তো? এখুনি? আমি এখন মেয়েকে পার্লারে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব। অলরেডি লেট! লালবাজারেই থাকব। তুই বাড়ি ফিরে যা। থানায় খবর দে। ডাক্তার ডাক।'

'তুই একবার দেখা দে না ভাই। এই বিপদে—'

'তুই বাড়ি যা।' অম্বুজ একটু বিরক্ত, 'ডোন্ট বিহেভ লাইক অ্যান অ্যাস। আমি থানায় খোঁজ নিচ্ছি অফিস গিয়ে।'

অংশ ৩

এ কেস অফ সুইসাইড ডিউ টু ওভার ডোজ অফ স্লিপিং পিলস্ (ভ্যালিয়াম-ওয়ান)। ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার তাই লিখলেন। মর্গ হয়ে বডি পেতে অম্বুজ অনেক সাহায্য করল। সব জায়গাতেই টাকা। মায় মর্গের ডাক্তারও। কেউ কিছু যে চেপে যাচ্ছে তা নয়। এমনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার এই কাজের মেয়েটি অবিবাহিত ঠিক আছে' ঘোড়ার মতো বড় বড় দাঁত দেখিয়ে মর্গের ডাক্তার শ্রীকান্ৎ তিউয়ারি বললেন, 'তবে, বার্জিন ছিল না মোটেই।'

'কী জানি' — বনবিহারী বলল, 'ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল একটা শুনেছি। কখন যে কী হয়েছে— আমার স্ত্রী তো অন্ধ।'

'না-না, তাতে কী আছে। ভয়ফ্রেন্ডের সোঙ্গে মনোমালিন্যের জোন্যেই হয়ত', 'ব' ও 'ভ' বিপর্যয় অব্যাহত রেখে ডা. তিউয়ারি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'প্রেগনান্ট ছিলো না।'

সিরিটি থেকে আশার বিধবা মা সাবিত্রী এসেছিল। সিরিটি বাজারে চাল বিক্রি করে ওর ভাই নেপাল। সেই মুখাগ্নি করল।

অংশ ৪

ঘুমের জন্য আধখানা ভ্যালিয়াম-১ ছিল প্রতিভার রোজকার বরাদ্দ। সেখান থেকে ২/১টা করে আশা সরাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। বেকবাগান যাবার আগের দিন রাতে বনবিহারী যখন তাকে ইশারায় বাইরের ঘরে ডাকে (এটার মধ্যে নতুন কিছু ছিল না আর ডাকলে আশা কখনও না করেনি)— সেদিনই প্রথম সে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে একটি ও পরে আর-একটি ট্যাবলেট খেয়ে একটা লেপাপোঁছা মুখে (এ-রকম ৩০ বছরের ব্যবধান থাকলে বেশ্যার মুখও যেমনটা হত) সে চিত হয়ে শোয় ও যথারীতি পা ফাঁক করে। তবে বরাবর যা হয়ে থাকে, ওষুধের দ্রব্যগুণে তার সেই চাপা গোঙানিগুলোর একটাও সেদিন ছিল না যা প্রায় অশ্রাব্য হলেও একদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রতিভার। বেডরুম থেকে 'কী হয়েছে রে আশা' বলে মশারি তুলে শূন্যতা হাতড়ে সে উঠে এসেছিল। আশা ততক্ষণে পা টিপে স্টোররুমে, তার শোবার জায়গায়।

'পেট কামড়াচ্ছে মাসিমা।'

'ওকে একটু গ্রাইপ-ওয়াটার দিয়ে দাও না গো।'

গায়ে হাত দিয়ে, 'একি গা তো গরম দেখছি।'

'তুমি আবার উঠলে কেন। যা করার কাল করা যাবে। যাও, শুতে যাও—'

'কটা বাজল?'

'সওয়া বারো। আমি হাতের কাজটা শেষ করেই আসছি।'

এই ছোট্ট মেয়েটা— শুধু বয়সে আর প্রতিষ্ঠায় নয়— এর শরীর ছোট, জ্ঞানগম্যি ছোট, এমনকি এর মাথাটাও কত ছোট। হঠাৎ থেমে গেছে বাড়। শরীরের, মনের। একে জড়বুদ্ধিই বলা চলে— বনবিহারী বরাবর মনে করত। এর পাপপুণ্যের জ্ঞান হয়নি। প্রতি খেপে আশা পেত একটি পঞ্চাশ টাকার নোট। তবে ইদানীং মাসে দু-একবারের বেশি ডাক পেত না।

সেদিক থেকে তাকে ঠকায়নি বনবিহারী। তবে, তার বালিশের তলা থেকে শেষবারের নোটটি পাওয়া যায়। সে তুলে রাখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ দৃশ্য

অংশ ১

সুধী পাঠক, আপনাদের মধ্যে যাঁরা কাহিনীর শুরুতেই ধরতে পেরেছিলেন যে এই কাহিনীতে আমি আর বনবিহারী এক হয়েও কেন আলাদা, তাঁরা আমার নমস্য। হ্যাঁ, ঠিকই যে, এখানে আমি আগাগোড়াই বনবিহারীর একটি প্রোজেকশান— স্বেচ্ছাচারী লেখক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ পরাধীন কাহিনীতে সে বনবিহারীর একটি অপর অস্তিত্ব মাত্র। আমি-র যদি কোনও রক্তমাংসময় নিজস্ব অস্তিত্ব থাকত, তাহলে প্রতিভা নিশ্চয়ই একই রাত্রে বেকবাগানে বনবিহারী ও নেই-কোথাও আমার সঙ্গে থাকতে পারত না।

কিন্তু সুধী পাঠক, কাহিনী শেষ হতে চলেছে। এবার দরকার একটা হেস্তনেস্ত। তাই নয় কি? এখন সময় হয়েছে এদের দু'জনকে অবিচ্ছেদ্যভাবে এক করে দেবার। যেন আলাদা করে চেনা না যায়। বিপ্লব ও/অথবা প্রতিবিপ্লব যে-ভাবে ইতিহাসে থাকে আর কি! তখন কে যে কী, তা বোঝা মুশকিল। অন্তত কিছুদিন। অন্যথায় যে-কোনও একজন যদি এ কাহিনী থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তো তাই যাক। অথবা, দুজনেই ধ্বংস হোক।

শেষ আলোকসম্পাতে, সুধী পাঠক, আসুন সেটাই দেখি।

অংশ ২

এটা কী? কোনও-কিছুর ভেতর একটা। ভেতর থেকে বাইরে যাবার আঁকুপাঁকু চেষ্টা যতবার করছে বনবিহারী (কলে-পড়া অবুঝ ইঁদুর) ততবার পিছলে পড়ে যাচ্ছে। দেওয়াল বেঁকে বিশাল কড়াই-এর মতো হয়ে যায় কখনও, কখনও কিনার পর্যন্ত উঠেও গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, সে দ্যাখে। কয়েদখানা, খাঁচা, পিঁজরাপোল, থানা-হাজত— কিছুই যদি না হয়— এটা যে একটা অবরুদ্ধতা যা থেকে বেরিয়ে-যাওয়া বলে কিছু নেই এ-রকম সাব্যস্ত করে হাল ছেড়ে দেবে, হেন সময়, সেই মুহূর্তে মা শতরূপা স্বয়ং এসে তাকে প্রাচীরের বাইরে ছুঁড়ে দেন।

সার্কাসের কামান থেকে উৎক্ষিপ্ত জোড়া-পা ও কোমরে-সেঁটে-থাকা দুই-হাতঅলা মানুষ-গোলার মতো শূন্যে উঠে গিয়ে সেভাবেই নেমে আসতে আসতে সে দেখতে পায়, নিচে আশার মা সাবিত্রীর মুখ-ব্যাদান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে।

সে কি ওখান থেকেই...

অংশ ৩

'এই যে, এই বাবু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবিত্রী (তখন কিছুটা শতরূপা) হাতের আঙুল থেকে বাঘিনীর নখ বের করে তাকে চেনায়। চিনিয়ে, আবার থাবার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। সে তার কাঁধে হাত রাখে। নখ বসে যেতে থাকে।

'আ-আমি, আমি নয়। বিশ্বাস করুন। আপনি—' বনবিহারী এই প্রথম চারিপাশে আমাকে খোঁজে। এ-ভাবে আমাকে স্বীকৃতি দেয়, 'আপনি ভাল করে খোঁজ নিন। অন্য কেউ। আমি নয়।'

সাবিত্রী ও বনবিহারী কার উদ্দেশে বলছে কথাগুলো? একটু আগে এগিয়ে-আসা একজোড়া বুট-পরা পায়ের ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ধ্বনি থেমে গিয়েছিল। এখন সেই বুটজোড়া সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেঁড়া ও কর্দমাক্ত একজোড়া বুট-পরা পা থেকে আমরা ধীরে ধীরে ওপরে চোখ তুলি।

দেখতে পাই, বুটের মালিক লম্বাপানা, গায়ের উড়ন্ত ওভারকোট, এলোমেলো আলগা টাই, মাথাভর্তি লালচে টাক— চলমানতা হঠাৎ থামিয়ে বাঁ দিকে ঈষৎ মুখ ফেরানো।

'না-না। সেই ১৯৭১-এ— দুনিয়া-কাঁপানো দশদিনের ভেতর দিয়ে যিনি হেঁটেছেন, ধর্মতলার মোড়ে দেখা সেই মূর্তির সঙ্গে এর যতখানি মিল ততটাই অমিল।' কে যেন বলেই গেল তাকে, 'এর নাম ডিং'।

অংশ ৪

'ইনিই?' চোখ থেকে কালো চশমা খুলে, ঝুঁকে, ঈষৎ ঝিঁক চোখে তখনও-নব্বইভাগ প্রস্তরমূর্তি তাকায় সাবিত্রীর দিকে, 'আপনার মেয়ের বয়স তো এঁর (বনবিহারীকে দেখিয়ে) তুলনায় বেশ কমই বলতে হবে! বছর-তিরিশ ছোট হবে, কী বলুন? না-না'— বনবিহারীর প্রতি, 'পালাবার চেষ্টা কোরো না। লাভ হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারী দেখল, সে চলৎশক্তিহীন।

বনবিহারী: আমি না। বিশ্বাস করুন, আমি ওকে মেয়ের মতো দেখতাম।

ডিং: ডাকতেও শিখিয়েছিলে বাবা বলে।

বনবিহারী: বাবা... বাবাই বলত আমাকে। ইচ্ছে ছিল ওকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করব।

ডিং: আচ্ছা?

বনবিহারী: একটি পাত্র ঠিকও করেছিলাম। নাম বিপ্লব সৎপথী। এ সি মার্কেটে মাছ বেচে। সম্ভবত সে আসত যখন আমরা—

ডিং: থাকতাম না।

সাবিত্রী: শাল্‌হা বেটিচোদ!

ডিং (সাবিত্রীর প্রতি): আচ্ছা। আপনি এবার আসুন মা। আমরা দেখছি ব্যাপারটা।

বনবিহারী: আমাকেও যেতে হবে।

ডিং: কোথায়?

বনবিহারী: বাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিং: বাড়িতেই যেতে হবে কিনা, 'আমরা' এখনও ঠিক করিনি।

আপত্তি করবে বলে বনবিহারী একবার মুখ তুলতেই আমি দেখলাম, একজন কোথা, সত্যিই তো, দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মাথার পিছনে বিকেলের সূর্য থেকে রুপো গলে পড়ছে। সেই তীব্র ছটার জন্যেই কি এ দৃষ্টিবিভ্রম?

দ্বিতীয়জন বেঁটেখাটো, শক্তপোক্ত হলেও মুখে পেশির বদলে শুধু চকচকে লাবণ্য। থুতনিতে মস্ত আঁচিল। গায়ে চীনা কোট। দু'জনে এত ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে যে যুগলমূর্তি মনে হয়। যেভাবে হোক আমি জানতে পারলাম এঁর নাম ডং। ইনি হাঁটছেন সেই ১৯৩৪ সাল থেকে। কত নদী, কত পাহাড় পেরোলেন— সেই থেকে থামেননি। ডং-এর পায়ে গামবুট।

এত ধুলো আর কাদা মাড়িয়ে এসেছে এই বুটজোড়া যে তাদের কর্দমনির্মিত মনে হয়।

অংশ ৫

বনবিহারী সেই যে নামিয়েছে, আর মুখ তোলেনি। সে এখন দু'জোড়া বুটের দিকে তাকিয়ে, পরবর্তী বেত্রাঘাতের জন্য অপেক্ষমাণ কুকুরের মতো। হায়, এ কে জানত, ইয়েনান থেকে লঙ্ মার্চ করে এসে সোল-ফাঁক হয়ে যাওয়া একজোড়া কাদামাখা চীনা বুটজুতো এসে একদিন তার ললাটলিপি লিখবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই বুটজোড়ার সঙ্গেই তার কথোপকথন হয়ে চলেছে এতক্ষণ।

'চলো'। জামার কলার ধরে তাকে হালকা করে একটা ধাক্কা দিয়ে, হ্যাঁ, বুটজোড়াই তো বলে উঠল, 'আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বনবিহারী বুঝতে পারল এতক্ষণ তাহলে সে বসে ছিল। পা মচকে আবার সে বসে পড়ছিল, 'না-না, অ্যাই— হাঁটো, হাঁটো', বলে ডিং এবার তাকে জোরে ধাক্কা দেয়।

অংশ ৬

পথ বেশি নয়। তবু হাঁটতে হাঁটতে এরই মধ্যে শীত চলে গেল। এখন বেশ গরমই তো লাগছে। চলা অব্যাহত রেখে ডং আর ডিং তাদের কোট ও ওভারকোট খুলে হাতে নিচ্ছে সে দেখতে পায়।

যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, হয়ত খুব খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে না। একেবারে মেরে ফেলতেই যে নিয়ে যাচ্ছে তা নয়। এত নিশ্চিন্তভাবে হেলেদুলে কসাইরা হাঁটে কি? ওদের এই গয়ংগচ্ছ হাবভাবে, শান্ততায়, হত্যাকারীর সেই চূড়ান্ত সঙ্কল্প কোথায়? যদিও রাস্তা সম্পূর্ণ অচেনা, কিন্তু দু-একটা কাক দেখা গেছে। হেঁটে গেছে অন্তত একটা নেড়ি কুকুর। কলকাতার গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয়, বিশেষত এই ধরনের ঝিরঝির বৃষ্টির পর (যা এখনই শুরু হল)। এই ধরনের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিলে। এখন সেটাও পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই অবস্থা একেবারেই নিরাশাজনক হয়ত নয়। ওই যে, ঝরঝর করে অনেকখানি জল ঝরে পড়ার শব্দ হল, ওটাও খুব চেনা। হয় কী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি থামার পরে, গাছের ছোট পাতা থেকে পড়ে, নিচের বড় পাতার ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় জল জমে। বড় পাতা যতক্ষণ পারে ধরে রাখে। তারপর আর পারে না। তখন হঠাৎ ঝরঝর করে সবটা ঢেলে দেয়। কাছাকাছি একটা সেগুন গাছ আছে নির্ঘাত। সেগুনের কোশার মতো মস্ত পাতাগুলো এ-জিনিস খুব করে। আচ্ছা, একটা পাখি শিস দিল না? নাকি, মনের ভুল?

কিছু আশা জেগেছে মনে। তাই সে বেঁটেখাটো, গোলগাল, থুতনিতে-আঁচিল লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওঁকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? কে সি দাশের সামনে ধর্মতলার মোড়ে কি?'

বলেই তার মনে পড়ল, আর-এ ৭০-এর দশকে দেওয়ালে দেওয়ালে স্টেনসিলে যার মুখ আঁকা থাকত, তার সঙ্গেও এর মুখের বেশ মিল, তাই না?

উত্তর আসবে না, জানা ছিল।

অংশ ৭

যেতে যেতে যখন গঙ্গা পড়ল এবং দেখা গেল এপার এখনও আলোকিত হলেও নদীর ওই পারে অন্ধকার— সেই সময় তারা লতাপাতায় ঢাকা একটা গেটের সামনে।

একটা ম্যানহোল। ঢাকনা তুলতে মই একটা। প্রথম পথপ্রদর্শক ডিং, তারপর বনবিহারী, তারপর ডং। ডং মাটিতে পা রেখেছে সবে, এমন সময় মইটা হুড়মুড়িয়ে সটান এসে পড়ল তার পিঠের ওপর। অথচ, সেটা একটা হালকা ছড়ির চেয়ে ভারি লাগল না দেখে, আমিও মনে করলাম, এমনটা হতেই পারে।

এ এক অদ্ভুত ছাই-এর পৃথিবী। মাটিতে ছাই, দেওয়ালে ছাই, বাগানের গাছপালা ছাইরঙের— ডিং আর ডঙের ছাইমাখা শরীর দেখে বনবিহারী বুঝল তারও সর্বশরীর ছাই-এ ভরে গেছে। সে মাথা তুলে দেখল, এখানে আকাশ নেই।

সামনে, ছাই-রঙা দেওয়ালের গায়ে ওল্টানো U-এর মতো এক লোহার গেট। তার মাথায় ছাই-এর পুরু আস্তরণের ওপর অর্ধগোলাকারে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' লেখা রয়েছে।

বন্ধ গেটের ভেতর থেকে কীসের চাপা গর্জন?

'আমরা এখানেই থাকি আজকাল' ডিং-ডং বলল একসঙ্গে। মাথা উঁচু করে। দ্বৈতকণ্ঠে।

অংশ ৮

ফার্নেসের গেটের সামনে বাঁশ ও কঞ্চির স্ট্রেচারের ওপর কেউ লম্বালম্বিভাবে শোয়ানো। ডিং-ডং দুজনে দুই প্রান্ত ধরে তার মুখ থেকে কোরা থানের শবাচ্ছাদন তুলে ধরে।

দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয় বনবিহারী।

'না--না।'

'না--না কেন। এটা শ্মশান আর এর সৎকার হবে ওই ফার্নেসে। সেটা দেখাতেই তো এনেছি তোমাকে। দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে। এই চেয়ারটায় বোসো দেখি শান্ত হয়ে ---'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না! না! না!' বনবিহারী চিৎকার করে ওঠে।

'এ-রকম করলে আমরা কিন্তু তোমাকে চেয়ারে বেঁধে রাখতে বাধ্য হব।' ডং দাঁত খুঁটছিল। টুথপিক কোটের পকেটে সযত্নে রেখে সে হুঁশিয়ারি দেয়।

'এই। পা নয়, পা নয়। আগে মাথা যাবে—'

অংশ ৯

গ্রর্‌র্‌র্‌র্‌!

গেট দুদিকে খুলে যাচ্ছে। গমকলের ছাঁকনি যেমন, লাল টকটকে ইস্পাতের জাল ঝকঝক-ঝিকিঝিকি শব্দে নড়াচড়া করছে। তার ওপর একটা শুকনো গাছের ডাল ছুঁয়ে দেয় ডং। ওইটুকু প্ররোচনাতেই এক হাত লাফিয়ে ওঠে যে শিখা, তার রঙ কমলা।

ফার্নেস থেকে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে অসহ্য-গরম হাওয়া। যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বনবিহারীকে দু'হাতে চেপে ধরে আমি বোঝাই, 'তাতে কী। বডিও ঢুকবে আর গেটও বন্ধ হয়ে যাবে।'

হলও তাই। কনভেয়র বেল্টের টানে আশার শব জালি ছোঁয়া মাত্র লাফিয়ে উঠল আগুন—সারা শরীরে আগুন ধরে গেল এক লহমায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল।

দু'দিক দিয়ে এগিয়ে এসে ফার্নেসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝনঝন শব্দে।

অংশ ১০

বনবিহারীর মাথা অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকে পড়ে ছিল বুকে। গেট বন্ধ হলে, এতক্ষণে তার ছাই-রঙা শরীরে ছাই-রঙা মন আবার ফিরে এসেছে মনে হল। আর, ছাই ঝেড়ে, তাই সে স্টুপিডের মতো জানতে চাইল, 'কতক্ষণ লাগে?'

'কী কতক্ষণ?'

'পুড়ে ছাই হয়ে যেতে?'

'এতক্ষণে হাত-পা সব হয়ে গেছে। দেখবে তুমি?'

কঁকিয়ে উঠে বনবিহারী একবার শুধু বলতে চেয়েছিল— 'না'। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল তার বদলে গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুধু বের হল। এবং, ততক্ষণে গ্রর্‌র্‌র্‌র্‌ শব্দ তুলে গেট আবার খুলে গেছে।

আগুনের দাঁত এখন আশার পেট-মাথা-বুক এইসব ছিঁড়ছে। কামড়ের কুরকুর..... কড়াং—শব্দ শোনা যায়। এখন শুধু একদলা মাংস। আর কিছু দগ্ধ হাড়-পাঁজর, অগ্নিবর্ণ জালি যা নাড়িয়ে চলেছে ঝকঝক শব্দে। হু-হু হাওয়া। বিকট গন্ধ।

আশার মাথা ভিতর দিকে, দেখা যায় না। পা দুটি এ দিকেই। পুড়ে পুড়ে কাঠকয়লা, তার পা-দুটি যে ভঙ্গিমায় অনিচ্ছুকভাবে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, তা বনবিহারীর একেবারে অপরিচিত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সে আর কিছু দেখেনি। চেয়ারের ওপর বসে থাকা অবস্থায় তার চিবুক তর্জনী দিয়ে তুলে ডিং বলল, 'অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

অংশ ১১

স্ট্রেচারে শুইয়ে, ডং দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল তাকে।

অজ্ঞান মানুষকে আবার বাঁধা কেন? বুঝতে দেরি হল না আমার। এখন ফার্নেস বন্ধ। তবে, দরজা আর একবার খুলবে। বনবিহারীর জন্য।

আমি জানতে চাইলাম, 'তাহলে আমি এখন কী করব? কোথায় যাব?'

'তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' ওরা দুজনে বলল। কোরাসে।

বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলে, সামনে যদি খাদ থাকে, মানুষ সেখানেই ঝাঁপ দেয়। নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে অনিশ্চিত মরণ ভাল। কিন্তু আমার সামনে, হায়, সে সুযোগও নেই। তাই আমি চিৎকার করে জানতে চাইলাম—

'আমি কেমন করে বেরুব? রাস্তা কোন দিকে?'

ডিং-ডঙের যুগ্মশরীর আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে।

ওরা এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যে বেঁটে মানুষটি যদি লম্বা হত তাহলে এর ডান কান ওর বাঁ কানে লেগে যেত।

যুগলমূর্তি উত্তর দিল না।

তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়।

আমি নয়। সহসা টের পাই, আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে।

সরে যেতে যেতে দেখতে পাই, ঐ, আবার খুলে গেল ফার্নেসের গেট। তবে গেট খোলার চিৎকার এতদূরে ভেসে আসে না। আগুন-রঙা জালির ঝিকিঝিকি নড়াচড়ার ওপর এখন নিশ্চয়ই কেউ শুয়ে নেই।

তবে খালিও থাকবে না।

একটু পরেই কনভেয়র বেল্টের টানে বনবিহারীর জিন্দালাশ ছোঁয়া মাত্র জালির ওপর লাফিয়ে উঠবে কমলা রঙের আগুন। বনবিহারীকে নিয়ে লাল ও কমলা আগুনের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিতর্ক ঝকঝক-ঝিকিঝিকি ভাষায় তুমুলভাবে শুরু হয়ে যাবে।

ফার্নেস গেট এখনও খোলা। এতদূরে আগুনের হলকা আসে না। বরং হাওয়া এখন বেশ ভিজে-ভিজে। ক্রমেই ঠাণ্ডা আর ফুরফুরে হয়ে আসছে। কলকাতার গা থেকে ভেসে আসছে চেনা গন্ধ।

বৃষ্টি এল বলে। ❑

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~